একটি প্রায় ভয়ঙ্কর গল্প

আহসান হাবীব





কোঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে যাওয়ার মতো একটা ঘটনা। অদৃশ্য হওয়া যায় না জেনেও অদৃশ্য হতে গেল দুই কিশোর। তারপর অন্য ঘটনায় জড়িয়ে গেল তারা। নানান মার-প্যাঁচ কাটিয়ে যখন সব কিছুর সমাধান হলো তখন মনে হবে—আরে এটাতো একটা ভয়ঙ্কর ঘটনাই হয়ে উঠতে গিয়েছিল প্রায়... ভাগ্যিস হয় নি!

একটি প্রায় ভয়ঙ্কর গল্প

আহসান হাবীব



একটি প্রায় ভয়ঙ্কর গল্প
আহসান হাবীব

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩

তাম্রলিপি-২২১

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম
তাম্রলিপি
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাসাদ ইমন তন্ময়

কম্পোজ
সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপালসাহা লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১২০.০০

EKTI PRAY VOYONGKOR GOLPO
By : Ahsan Habib
First Published : February 2013, by A K M Tariqul Islam
Director : Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 120.00 $: 6

ISBN : 984-70096-0221-4

উৎসর্গ

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের...

(তারা পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, এ বই পড়ার সময়ই পাবে না!)

ভূমিকা

ছোটদের জন্য লেখা আমার জন্য খুবই কঠিন কাজ। তারপরও মাঝে মাধ্যে লিখতে ইচ্ছে করে। আর বইমেলা আসলে তো কথাই নেই। মনে হয় একটা কিছু লিখে ফেলি। এবারও তাই হলো। জটিল একটা কাহিনী শুরু করেছিলাম... সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। পেরেছি কিনা তার বিচার করবে এই বইয়ের পাঠকরা। তবে আশার কথা হচ্ছে ছোটরা সবসময় ক্ষমাশীল। ভুল-ভ্রান্তি তাদের চোখ এড়িয়ে যতাবে... সেই আশায়!

সবাইকে মহান একুশের শুভেচ্ছা।

আহসান হাবীব
পল্লবী, ঢাকা।

অদৃশ্য হওয়ার উপায়

মুশফিক এর অদৃশ্য হওয়াটা এখন খুবই জরুরি। কিভাবে হবে এটা নিয়ে সে বিশেষ চিন্তিত ছিল। বাদলই তাকে সমাধানটা দেয়।

তুই শিওর ঐ সাধু অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র জানে?

ওভার শিওর

ওভার শিওর বানান করতো আগে।

আমার সঙ্গে ফাজলামো করিস? বেশ আমি গেলাম বলে হাটা দেয় বাদল। মুশফিক ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরে বাদলের।

'আহ কেন রাগ করছিস একটু ইয়ে করলাম তোর সাথে ... আরে ইংলিশ স্যার বেছে বেছে তোকেইতো শুধু বানান ধরে... মনে নেই গত শনিবার স্যার তোকে ক্রিসেনথিমাম ফুলের বানান ধরল আর তুই বললি স্যার অন্য ফুলের বানান বলি হা হা হা... ।'

দেখ তুই জানিস কাজের কথার সময় ফালতু কথা আমি একদম পছন্দ করি না।

আচ্ছা বল তারপর...

তারপর আর কি ঐ সাধুর কাছে যাবি।

ঐ সাধু অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র জানে?

ঐ সাধু অনেক কিছুই জানে।

তুই যাবি আমার সাথে?

না ।ঐ সাধুর কাছে যেতে হয় একা।

বাদলের কাছ থেকে সাধুর ঠিকানা নিয়ে মুশফিক একটু চিন্তায় পড়ল। কবে যাবে সে বাসা থেকে, তাকে একা ছাড়বে না। যেতে হবে আবার অমবশ্যার রাতে। কি উপায় হবে, কিন্তু যাওয়াটা খুবই জরুরি। কারণ

একটা বিশেষ ব্যাপার জানতে খুব শিগ্রী তাকে অদৃশ্য হতেই হবে নইলে... সে আর ভাবতে পারে না। মুশফিকের মাথা গরম হয়ে ওঠে।

ঘটনাটা ঘটেছিল স্কুলে।

তাদের ক্লাশের জেনিফারকে তার একটু ইয়ে লাগে...। মানে ভালো লাগে আর কি। তার মানে অন্য কিছু নয়। তার জন্য সে তার পাশে সীট রাখে। তাদের ক্লাশে ছেলে-মেয়ে এক সাথে বসতে বাধা নেই। জেনিফার তার পাশেই বসত। এমনও হয়েছে তারা ক্লাশের বই ভাগাভাগি করে আনত অর্থাৎ আট পিরিয়ডের আটটা বই না এনে সে চারটা আর জেনিফার চারটা বই আনত তাতে করে দুজনেরই ব্যাগের ওজন কিছু কমত। তাদের ক্লাশের অনেকেই এমনটা করে। বুদ্ধিটা অবশ্য ক্লাশ টিচার বদি স্যারের।

সবই ঠিক ছিল... কিন্তু হঠাৎ একদিন জেনিফার ফার্স্ট বেঞ্চে সোহেলের সাথে বসল এবং মুশফিককে আর চিনতে পারল না। আর সেদিনই সে ফেঁশে গেল চারটা বই এনে । ফিফথ পিরিয়ডে ধর্ম স্যার আরবি বই না আনার জন্য ক্যাক করে চেপে ধরল ঘাড়ের কাছটায় যেমন ধরেন তিনি। এখন মুশফিক কি করে বলে যে তার কি দোষ জেনিফার তার সাথে বিট্রে করেছে। ওর আর তার পাশাপাশি বসার কথা। সে চারটা বই আনবে আর জেনিফার চারটা বই আনবে।

সে যাই হোক ঐ দিন ছুটির পর টিপু মুশফিককে যা বলল তাতে করেই তার মাথায় অদৃশ্য হওয়ার ধারণাটা এল। মানে ইচ্ছেটা জাগল। টিপু নাকি দেখেছে সোহেল জেনিফারদের বাসায় যায় এবং তারা এক সঙ্গে বদি স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে। বদি স্যার আবার জেনিফারের আব্বার খুব বন্ধু তাই স্যার শুধু মাত্র জেনিফারদের বাসা গিয়েই প্রাইভেট পড়ান। কিন্তু সঙ্গে সোহেল কেন জুটল? হোয়াই??

- তোর কি মনে হয় ওরা পাশাপাশি বসে বদি স্যারের কাছে পড়ে?

- তাইতো পড়বে... সমস্যা কী?

- হুম । মুশফিক গম্ভীর হয়ে যায়। তবে হঠাৎ খেয়াল করে টিপুর মুখে মুচকি হাসি

- হাসলি ক্যান?

- তোর কথা ভেবে।

- মানে?

- তুই এক কাজ কর... ভ্যানিসিং ক্রিম মেখে ভ্যানিস হয়ে একদিন জেনিফারদের বাসায় গিয়ে সব দেখে আয় ওরা বদি স্যারের কাছে কি ভাবে পড়ে... হা হা হা

মুশফিক অনেক কষ্টে টিপুর মুখে একটা দশাসই ঘুষি মারার ইচ্ছে সামলাল। কারণ টিপু গায়ে গতরে তার চেয়ে বেশ নাদুস নুদুস।

অবশেষে এক রাতে নিজের ঘরে কোল বালিশ কাথা চাপা দিয়ে জানালার একটা শিক খুলে পালাল মুশফিক (তার ঘারের জানালার একটা শিক ঢিলা অনায়াসে খোলা যায় আবার লাগানোও যায়)। জাম গাছের নিচে একটা সাইকেল আগেই রেডি করে রেখেছিল। সেটা চেপে চম্পট। রাত তখন কত হবে? দেড়টা।

মুশফিক যথেষ্ট সাহসী ছেলে। শুধু সমস্যা যেটা হচ্ছে গায়ে জোর নেই। একটু টিং টিঙা টাইপ। তবে সাইকেলে উঠলে সে বাহাদুর। ইন্টার ডিসট্রিক্ট সাইকেল রেসিং-এ সে একবার চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল। এটা সবাই জানে।

সে যাই হোক গভীর রাতে সাই সাই করে ছুটল মুশফিক। ঠিকানা শহরের শেষ মাথায় মুরাদ নগর। জায়গাটা ভাল না। অনেক আগে একবার বাদলের সঙ্গে গিয়েছিল। সঙ্গে বাদল থাকলে কোনো ব্যাপার ছিল না। বাদলটাও বিট্রে করল, চারদিকে বিট্রেয়ার। আকাশে গোল একটা চাঁদ। বাতাসটা কেমন ভেজা ভেজা সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। এখন কি আবার হবে নাকি কে জানে। মুশফিকের বুকটা একটু যেন ধুক ধুক করে।

বাদলের ঠিকানা অনুযায়ী সাধুর আস্তানা খুঁজে পেতে খুব বেগ পেতে হয় না। আশে পাশে কিছু নেই একটা ছাপড়া ঘরে সাধুকে পাওয়া গেল। সাধু যেন তার অপেক্ষাতেই ছিল। মাটিতে সাইকেলটা শুইয়ে রেখে এগিয়ে গেল মুশফিক। আর তখনই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামল ... মুশফিককে অবাক করে দিয়ে সাধু বলল

অদৃশ্য হতে চাও?

জি- জি আ-আপনি কিভাবে বুঝলেন?

হা হা ... আজ যারা আসবে তারা সব অদৃশ্য পাগল জাতক... কিন্তু পারবি নারে পারবি না বড় কঠিন এই খেলা ... পারবি না

জি পারব... আপনি খালি বলেন কি করতে হবে?

ময়লা চট গায়ে পড়া সাধু বাবা চোখ বন্ধ করে সাদা দাড়িতে আঙ্গুল চালায়। বির বির করে কি বলে বোঝা যায় না। মুশফিক আরেকটু এগিয়ে বসে। নাছোড়বান্দার মতো বলে

সাধুজী বলেন কি করতে হবে অদৃশ্য হতে হলে?

তিনটা জিনিস লাগবে।

কি জিনিস?

ঠাডা পড়া মরা মানুষের মাথার চুল , একটা সাদা মুরগি আর কালো মাটির হাড়ি।

ঠাডায় মরা মানুষ কোথায় পাব সাধুজী?

মুশফিকের কথার উত্তর দেয় না সাধুজী, বলতেই থাকে । '... সন্ধ্যা রাইতে এক দামে সাদা মুরগি কিনবি... কালো কলসি কিনবি না, চুরি করবি... তারপর অমবস্যা রাইতে ঠাডা পড়া মরা মানুষের মাথার চুল কলসি আর সাদা মুরগি নিয়া যাবি ধলপুরের শ্মশানে... সাথে এক বোতল কেরোসিন নিবি...

- ধলপুর শ্মশানটা কোথায়?

এবারও মুশফিকের কথার উত্তর দেয় না সাধুজী, বলতেই থাকে ।

'... আগুন নিভে নাই এমন চিতার উপর খালি পায়ে খাড়ায়া এক ঢোক কেরোসিন খাবি তারপর আছাড় দিয়া কলসিটা ভাঙবি। তারপর মুরগির মুখে ঐ ঠাডা পড়া মরা মানুষের চূল দিয়া সাদা মুরগীর মুখটা বাইন্ধা কলসির মুখ দিয়া মুরগিডারে বাইর কইরা বলবি

'যারে মুরগি যা
কসুর বাইন্ধা খা
সামনে যারে পাবি তারেই
দিবি ঘা...!'

- তারপর?

- তারপর ঐ কলসির ভাঙা গলা দিয়া চায়া দেখবি একটা মানুষ... তারে কবি ' আমি যা চাই তাই করেন আমারে...'

- তারপর আমি অদৃশ্য হয়ে যাব?

সাধু কথা বলে না মিট মিট করে হাসে আর মাথা নারে। আর তখনই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে থাকে। সাধু চেচিয়ে উঠে 'যা যা ভাগ ভাগ... জলদি ভাগ!' দূরে কোথাও কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পরে। মুশফিক সাধুর ঝুপড়ি থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়। চারদিক কালো হয়ে আসছে। মুশফিক ছুটতে শুরু করে... আর তখনই বিকট শব্দে বাজ পড়ে খুব কাছে কোথাও মুশফিকের মনে হয় তার উপরই বাজটা পড়েছে যেন। দুই কানে তালা লেগে যায়। সে দাঁড়িয়ে পড়ে কেমন একটা পট পট শব্দ হয়। ঘুরে তাকিয়ে দেখে সাধুজীর ছাপড়া ঘরে আগুন জ্বলছে। হতভম্ব হয়ে যায় মুশফিক তবে কি সাধুজীর উপরই বাজ পড়ল?

বাদলকে নিয়ে তার বাবা এসেছেন। কাচা বাজারে। সময়টা সন্ধ্যা। বাদল অবশ্য খুবই বিরক্ত। এ সময় খেলা ধুলা ফেলে বাবার সঙ্গে বাজারে আসার কোনো মানে হয়? কিন্তু উপায় নেই। কাল দাদার চতুর্থ মৃত্যু বার্ষিকী বাসায় মিলাদ হবে তার কেনাকাটা করতে বাবার সঙ্গে আসা। বাদলের দু হাতে কম করে হলেও চারটা ব্যাগ বাবার হাতেও গোটা দুয়েক। মিলাদে জিলাপী সিঙ্গারা মনসুর এসবের একটা প্যাকেট দিয়ে দিলেই হয় তা নয় বাবা সব সময় বাসায় বাবুর্চি ডেকে হৈ হুল্লোড় করে বিরানী রেধে দাদার মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেন। আর সব ঝামেলা পোহাতে হয় বাদল আর ছটকু কে। অবশ্য ছটকুকে তেমন কিছুই করতে হয় না, ছটকু বাদলের ছোট ভাই মহা ফাঁকিবাজ গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়ায় ...আর সব কাজ বাদলের ঘারেই এসে পড়ে।

বাদল একটু চিন্তায় আছে কারণ গতকাল মুশফিকের ঐ সাধুর কাছে যাওয়ার কথা রাতে। গতকাল অমবশ্যার রাত ছিল। গিয়েছিল কিনা কে জানে। স্কুলে যখন আসে নি। হয়ত গিয়েছিল।

এই বাদল

জ্বি।

হা করে কি ভাবছিস ব্যাগটা ধর না ঠিক মত পোলাও এর চালটা ঢালবেতো।

বাদল আসলে মুশফিকের বিষয়টা নিয়ে একটু অন্যমনষ্কই ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে বস্তার মুখ খুলে ধরে। এই সময় একটা হই চই শব্দ ওঠে কারা সব চেচিয়ে উঠে... ধর ধর...!

সবাই ঘুরে তাকায়। বাদলও তাকায় কিন্তু বুঝতে পারে না। কিন্তু বাদলের বাবার ভ্রূ জোড়া কুচকে ওঠে।

আশপাশ থেকে একটা হাসির হুল্লোড়ও ওঠে যেন।

কি হলো বাবা? বাদল জানতে চায়।

আশ্চর্য! বাবা স্বগক্তি করলেন। 'তোর বন্ধু মুশফিককে দেখলাম মনে হচ্ছে!'

কই?

ঐ যে ছুটে পালাল।

ছুটে পালাল?

হ্যাঁ ... তাইতো মনে হলো একটা খালি মাটির কলসি নিয়ে ছুটে পালাল।

কালো রঙের কলসি?

তুই জানলি কি করে? বাবা ভ্রু কুচকে তাকান বাদলের দিকে। বাদল থতমত খেয়ে যায়। কি বলবে? সে জানে অদৃশ্য হতে কি কি লাগে ঠাডা পড়া মরা মানুষের মাথার চুল মাটির কলসি (চুরি করা) আর একটা সাদা মুরগি।

(এক দামে কেনা) কারণ সেও একবার অদৃশ্য হবার জন্য গিয়েছিল ঐ সাধুর কাছে বিষয়টা মুশফিকের কাছে গোপন করেছিল।

কিরে বললি না কাল কলসি তুই বুঝলি কী করে? বাদল আমতা আমতা করে। এ সময় আশপাশ থেকে বেশ হাসির কথাবার্তা শোনা যায়। কলসি চুরি নিয়েই এখনো ঠাট্টা তামাশা চলছে। একজনকে বলতে শোনা গেল 'ছোরাটা বেশ অনেকক্ষণ ধরেই দরদাম করছিল কলসিটার।'

- পোশাকে আষাকে বেশ ভদ্র লোকের ছেলেই মনে হল

- আচমকা কলসি নিয়ে দৌড় দিল। সাহস আছে ছোড়ার।

- চুরিই যখন করবি এত দরদাম করছিলি ক্যান বাপ? একজন হাসতে হাসতে বলে

- যাতে কলসীওলা একটু কম ঠকে এই আর কি ... এবার এক সঙ্গে অনেকেই হেসে উঠল।

মুশফিকের প্রতি বেশ শ্রদ্ধাবোধ হল বাদলের। সত্যি ও তাহলে কাজে নেমে পড়েছে। কলসি চুরি করল তারপর সাদা মুরগি, কিন্তু ঠাডা পড়া মরা মানুষের মাথার চুল পাবে কোথা থেকে? চিন্তিত ভঙ্গিতে বাজারের ব্যাগ

হাতে বাবার পিছনে পিছনে হাটতে থাকে বাদল। পিছিয়ে পড়ার জন্য দু একবার ধমকও খেল।

পরদিন বাদলদের বাসার মিলাদের পর বিকালে মুশফিকের দেখা পেল বাদল স্কুলের মাঠে।

- কিরে তুই মিলাদে এলি না যে?

- সম্ভব ছিল না। গম্ভীর হয়ে বলল মুশফিক।

- অবশ্য না এসে ভালোই করেছিস বাবা তোকে কলসি চুরি করতে দেখেছে বাজার থেকে। বাদলের ধারণা ছিল এ কথা শুনে মুশফিক চমকে উঠবে। কিন্তু না মুশফিকের কোনো ভাবান্তর হলো না। কোনো কথাই বলল না গম্ভীর হয়ে ঘাস চিবাতে লাগল ছাগলের মতো।

- তুই তাহলে কাজে নেমে পড়েছিস?

-হু

- মানে গিয়েছিলি সাধুর কাছে?

- হু। সাধুর কথা মতো জিনিষপত্রও সব জোগাড় করে ফেলেছি।

- কি কি জিনিস? না জানার ভান করে বাদল জানতে চায়।

- ঠাডা পড়ে মরা মানুষের মাথার চুল কলসি আর সাদা মুরগি।

- বলিস কি? ঠাডা পড়ে মরা মানুষের মাথার চুল কোথায় পেলি তুই?

মুশফিক বুকে হাত দিয়ে এবার লম্বা করে শ্বাস ফেলে। এই অংশটুকু তার জন্য আসলেই একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। এখন পর্যন্ত কারো সঙ্গে শেয়ার করেনি। এবার খুলে বলল বাদলকে। সেই তার চোখের সামনে ঢাডা পড়ে সাধুর মৃত্যু দৃশ্য... !! বাদলের মুখটা হা হয়ে গেল। মুশফিকের এত সাহস? ঐ অবস্থায় সে সাধুর মাথার চুল জোগাড় করল?

শেষ পর্যন্ত বাদলও স্বীকার করল যে সেও একবার অদৃশ্য হবার কৌশল জানতে গিয়েছিল ঐ সাধুর কাছে কিন্তু জিনিসপত্র সংগ্রহের কৌশল শুনে তার আর সাহস হয় নি।

- তুইও অদৃশ্য হতে চেয়েছিলি?

- হু।

- কেন?

- সে অনেক কাহিনী আরেকদিন বলব তোকে। বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাদল। মুশফিক অবশ্য বুঝে যায় কেস। তার মতোই কিছু একটা হবে।

দুই বন্ধুতে শেষ পর্যন্ত রফা হয়। অদৃশ্য হতে শ্মশানে তারা এক সঙ্গেই যাবে। মুশফিক একা একা এতটা করেছে বাকিটায় বন্ধু হিসেবে তাকে সাহায্য করা বাদলের একান্ত কর্তব্য। তবে না বাদল এর অদৃশ্য হওয়ার খুব একটা ইচ্ছে নেই আপাতত। তবে মুশফিক অদৃশ্য হলে পরে তাকে একটা কাজ করে দিতে হবে, সেটা অবশ্য এখন বলা যাবে না। বিশেষ গোপনীয়।

- আমরা দুজনেই এক সঙ্গে অদৃশ্য হতে পারি।

- না সম্ভব না।

- কেন?

- সাধু আমাকে বলেছিল। দু' জন এক সঙ্গে অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

- বেশ তাহলে আমিই না হয় হব আগে।

- তুই হ। তুই এত কষ্ট করলি। তোর হওয়াই দরকার। তবে অদৃশ্য হওয়ার পর তুই আমার একটা কাজ করে দিবি প্রতিজ্ঞা কর।

- প্রতিজ্ঞা করতে হবে না। বললামতো করব। দরকার হলে তোর কাজটাই আগে করব।

- সত্যি? বাদল এর চোখে পানি এসে যায়। ' তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড...' প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে বাদল।

রাত্রি ভয়ঙ্কর!

অমবস্যার রাতে দুজনে বেরুল। বাদল আর মুশফিক। সাধু সে রকমই বলেছিল। কৃষ্ণপক্ষের শেষ চাঁদের রাতে বেরুতে হবে। সঙ্গি তাদের একটা ট্রিপল গীয়ার রেসিং সাইকেল (ধার করা, সাইকেলটা আসলে টিপুর নগদ ৫০ টাকা আর একটা কমিক্স দিয়ে এক রাতের জন্য নিয়েছে!)। সাইকেলের পিছনের ক্যারিয়ারে একটা ছোট বস্তায় সেই মৃত সাধুর 'ঠাডা পড়া' মাথার চুল, একটা কালো কলসি আর সাদা মুরগি আর এক বোতল কেরোসিন। মুরগিটার মুখ বাধা আছে যেন শব্দ করতে না পারে। বস্তাটা শক্ত করে বাধা হয়েছে সাইকেলের পিছনের ক্যারিয়ারে। সাইকেল চালাচ্ছে মুশফিক সামনের কানেকটিক রডে বসেছে বাদল। ঘটনা চক্রে আজও টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। তারা প্রধান সড়ক থেকে নেমে এসেছে একটা ছোট রাস্তায় রাস্তাটা আঁকা-বাঁকা কিন্তু মসৃণ।

- শ্মশানটা তুই চিনিস তো? মুশফিক জানতে চায়।

- চিনি চিনি কতবার বলব।

- আগে এসেছিলি?

- আশ্চর্য! আগে না আসলে চিনব কিভাবে?

- যাক তাহলে চিন্তা নেই...

- আমি চোখ বন্ধ করেও যেতে পারব। তবু জোরে প্যাডেল চালা বৃষ্টি জোড়ে নামলে শ্মশানের মাটির রাস্তাটা পিছল হয়ে যাবে তখন কিন্তু সাইকেল চালানোই কঠিন হবে।

মুশফিক সাইকেলের স্পিড বাড়িয়ে দিল। রেসিং সাইকেলের টিউবহীন চিকন টায়ার সাই সাই করে ঘুরতে ঘুরতে ছুটছে... মসৃণ রাস্তার উপর।

- কতক্ষণ লাগবেরে? হাঁপাতে হাঁপাতে বলে মুশফিক।

- দু ঘন্টাতো বটেই।

- এত দূর?

- হ্যাঁ দূর আছে।

- আমরা ভোর রাতের আগে ফিরে আসতে পারবোতো দুজন?

- দুজনে ফিরব কেন? ফিরবতো একজন।

- মানে?

- বাহ তুই তখন অদৃশ্য না?

আরে তাইতো বিষয়টা কল্পনা করে এই প্রথম হাসি পায় মুশফিকের। সত্যি সে অদৃশ্য হতে পারবেতো? তার কেমন ভয় ভয় লাগে। আর একবার যদি অদৃশ্য হতে পারে তাহলে ... বাকিটা আর ভাবতে পারে না মুশফিক, কল্পনায় আনন্দে বুকের ভেতরটা গুড় গুড় করে।

- এই কি হল গর্তে ফেলবি নাকি ? চেঁচিয়ে ওঠে বাদল।

নিজেকে সামলে নেয় মুশফিক। সাইকেলটা আবার রাস্তার মাঝখানে নিয়ে আসে। আশে পাশে কেউ নেই অন্ধকার রাস্তা। মাঝে মধ্যে আশেপাশের কোনো বাড়ি থেকে এক চিলতে আলো এসে পড়ে সেই আলোয় সাই সাই করে ছুটে যাচ্ছে তারা দুজন। হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটো রাস্তার ভ্যাগাবন্ড কুকুর পিছন পিছন তারা করে। তখন ওদের ভালোই লাগে মনে হয় মন্দ কি সঙ্গিতো পাওয়া গেল একটা, হোক না কুকুর... একটা প্রাণীতো। তবে কুকুরগুলো খুব বেশিদূর আসে না। তারা তাদের সীমানা অতিক্রম করে না কখনো।

- দে এবার আমি চালাই বাদল বলে।

- না আমিই পারব। তুই টর্চটা জ্বালিয়ে সামনে ধর... অনেক অন্ধকার।

- আমরা প্রায় চলে এসেছি। ফিস ফিস করে বাদল।

বৃষ্টি টিপ টিপ করে পড়ছে কাদা মাটির রাস্তায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ওদের সাইকেল। সাইকেলটা রেসিং সাইকেল বলে রক্ষা। চার পাঁচটা গিয়ার। টপ টপ করে দু'তিনটে গীয়ার পিছনে চলে এসেছে সাইকেলের । স্পিড কমিয়ে দিয়েছে মুশফিক।

- আমার মনে হয় বাকিটা আমরা হেটে যাই চল।

- এসে গেছি?

- হ্যাঁ ... এটাই ধলপুর শ্মশান... ঐ দেখ একটা চিতায় আগুন জ্বলছে এখনো...

- হ্যাঁ ঐ চিতায় দাঁড়িয়েই আমাকে কাজটা করতে হবে।

তারা সাইকেল থেকে নেমে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে একটা চিতা জ্বলছে, নিভু নিভু হয়ে...। ওরা সাইকেলটা একটা গাছের আড়ালে রাখল। আর তখনই দুজনে আঁতকে উঠল। এক সঙ্গে বেশ কয়েকটা গলা শোনা গেল খুব কাছে। বয়স্ক মানুষের গলা। অন্ধকারে বোঝা যায় নি। একটা চালা ঘরের মতো জায়গা। সেই ঘরটা থেকে বের হয়ে এল কয়েকজন মানুষ। তার মানে মানুষগুলো ঐ ঘরে ছিল এতক্ষণ। তারা সবাই চিতাটার পাশে এসে দাঁড়াল। মোট চার জন। এর মধ্যে একজন মহিলা। মহিলার হাত পেছন দিকে বাধা মুখও বাধা। একজন মহিলাটাকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় চিতার উপরই ফেলে দিল। মহিলাটি ফোপানোর মতো শব্দ করল। কেউ একজন ভারী গলায় বলল

- গুলি কর? দেরী করিস না।

- গুলি করলে শব্দ হবে ... অন্য ব্যবস্থা রাখছি। বলে দ্বিতীয় আরেকজন একটা লম্বা শাবলের মতো কিছু টেনে বার করল কোথাও থেকে।

মুশফিক আর বাদল হতভম্ব হয়ে গেল ... এসব কি হচ্ছে? ফিস ফিস করে বলল বাদল, 'মহিলাটাকে মেরে ফেলবে মনে হচ্ছে ...।'

' আমাদের কিছু করা উচিত।'

' কি করব? '

'একটা কিছু করতেই হবে ... দাঁড়া এক মিনিট...' বলে সাইকেলের ক্যারিয়ার খুলে বস্তাটা বের করে মুশফিক।

- কি করছিস?

- কলসিটা বের করি... তুই মুরগিটা ধর। শব্দ যেন না করে...

ওদের কথাবার্তা হয় নিঃশব্দে!

ওদিকে শাবল হাতে লোকটা এগিয়ে আসছে মহিলাটার দিকে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু নিভু নিভু চিতার আগুনে দেখা যাচ্ছে মহিলাটার ভীত সন্ত্রস্ত মুখ। অন্য লোক দুজন একটু পিছিয়ে গেল।

- তুই কি করতে চাচ্ছিস? ফিস ফিস করে বাদল

- প্রথমে এই কলসিটা ছুড়ে মারব ঐ বাড়ির দেয়ালটায়, শব্দে...

- দারুণ... আমিও একটা কাজ করি ... বলে বাদল কেরোসিনের বোতলটা নিয়ে ডান দিকে সরে যায়। ওরা দুজন তখন কি করছে তারা নিজেরাও জানে না. তবে এটা জানে একটা কিছু করতেই হবে মহিলাটাকে বাঁচাতে। শ্মশানে এসে অদৃশ্য হওয়ার চিন্তা তখন মাথা থেকে পুরোপুরি উধাও।

রড হাতে ঢ্যাঙ্গামতো লোকটা এগিয়ে এসে দু হাতে রডটা উপরে তুলল আর ঠিক তখনই বিকট শব্দ... বুমমমম! যেন বোমা ফাটল!! শব্দটা আসলে কলসি ফাটার কিন্তু অন্ধকার রাতে চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভয়ানক এক শব্দ হলো ... চমকে উঠল লোকগুলো । রড হাতে লোকটা সবচে বেশি চমকালো যেন... রড ফেলে লাফ দিয়ে সরে যেতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল প্রায় নিভে আসা চিতেটা। আর কি আশ্চর্য রড হাতের লোকটার গায়ে আগুন ধরে গেল দপ করে, অবশ্য তখন লোকটার হাতে আর রডটা ছিল না। মহিলাটা গরিয়ে সরে গেল চিতার আগুন থেকে একটু দূরে। অন্যদুজন লোক প্রচণ্ড ভয় পেয়ে কি করবে বুঝতে পারছে না। তখনই তৃতীয় এ্যাটাক... সাদা কি একটা উড়ে এসে পড়ল লোকদুটোর মাঝখানে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ... জিনিসটা আসলে কি বোঝার চেষ্টাও করল না লোক দুটো। লাফিয়ে গিয়ে একটা মটর গাড়িতে উঠল। এতক্ষণ ওরা যেটাকে একটা চালা ঘড় ভেবেছিল সেটা আসলে একটা বড় সড় গাড়ি, মুহূর্তে গাড়ি স্টার্ট করে ছুটতে লাগল পাগলের মতো আর আগুন লাগা লোকটা ছুটতে লাগল গাড়িটার পিছনে তার শরীরের আগুনটা তখন আরো বড় হয়ে উঠেছে ... । ভয়ানক এক দৃশ্য। সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে ওরা দুজনই হতভম্ব হয়ে গেল। ওদের চেয়েও হতভম্ব মহিলাটি কোনো মতে উঠে বসে অবাক হয়ে দেখল দুদিক থেকে অন্ধকার ফুড়ে দুটো কিশোর তার দিকে এগিয়ে আসছে!

মহিলাটির মুখের বাধনটি তখন কোনোভাবে খুলে গেছে মহিলা অস্ফুষ্টভাবে বলল

তোমরা কারা? তোমরাই কি আমাকে বাঁচিয়েছ?

বাদল আর মুশফিক একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। এমন ভাবে তাকাল যেন তারা কেউ কাউকে দেখছে না। যেন তারা সত্যি সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেছে... দুজনেই।

পুলিশ!

পরদিন ক্লাশে ওরা দুজন এল এক সাথে। মাঝখানে একদিন কামাই হয়েছে দুজনেরই। আজ আবার দেরী হলো। ক্লাশ শুরু হয়ে গেছে। ক্লাশ টিচার বদি স্যার বোর্ডে কিছু লিখছিলেন। বাদল আর মুশফিককে দেখে থমকে গেলেন যেন। আর ক্লাশের সবার মুখে মুচকি হাসি। মুশফিকের মনে হল জেনিফার গম্ভীর আর সোহেলও যথেষ্ট গম্ভীর।

কি শ্মশান থেকে আসা হলো?

ভেতরে ভেতরে দুজনেই চমকাল। ওরা শ্মশানে গিয়েছিল এটা ফাঁস হল কিভাবে? টিপু জানত সে কি সবাইকে বলে দিয়েছে। ঢোক গিলল দুজন এক সাথে। এর মানে কী ?

স্যার ভেতরে আসব?

কেন ? ভেতরে কি করতে আসবি তোরা? স্যার চকটা টেবিলের উপর রেখে কোমড়ে হাত দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তোদের দুটোকেই পুলিশে দেয়া উচিত। একদম হাজতে নিয়ে ডান্ডাবেরী পড়িয়ে বেদম ধোলাই দরকার তোদের...

ক্লাশে অস্পষ্ট একটা হাসির হুল্লোড় উঠল। মুশফিক আর বাদল দুজনেই দেখল সবার মুখে হাসি। তবে মুশফিক যা বুঝল জেনিফার গম্ভীর। সোহেলও। ওরা দুজন পাশাপাশি বসেছে।

আর তারপরই একটা ঘটনা ঘটল এক সঙ্গে বদি স্যার সহ ক্লাশের সবার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছনে তাকিয়ে দেখে হেড স্যার দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে দুজন পুলিশ অফিসার।

এই যে এরা বাদল আর মুশফিক। হেড স্যার বলেন। হেড স্যারও যথেষ্ট গম্ভীর।

তোমরা বাদল মুশফিক ?

ঢোক গিলে মাথা নারে দুজন।

আমার সঙ্গে তোমাদের একটু থানায় যেতে হবে। দুজনেই। কুইক... চল।

- আমি কি আসব ওদের সঙ্গে? হেড স্যার বলেন

- না। ওদের দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি।

ওরা দুজন যখন পুলিশের গাড়িতে উঠছিল তখন সমস্ত স্কুল যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। যার যার ক্লাশের দরজায়। তাদের স্কুলের দুটো ছেলেকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! বাদল আর মুশফিকের খুব লজ্জা লাগছিল। নিজেদের কেমন চোর চোর লাগছিল। সব কি ফাঁস হয়ে গেল? পুলিশ জেনে গেল কিভাবে? সেই মহিলাটা সব বলে দিয়েছে? কিন্তু তাদের কি দোষ তারাতো মহিলাকে আরো বাঁচাল।

থানায় নিয়ে দুজনকে দুটো আলাদা ঘরে নেয়া হল। দু'জন আলাদা আলাদা পুলিশ অফিসার দুটো খাতা নিয়ে জেরা করতে বসল।

- তুমি মুশফিক?

- জ্বি।

- অদৃশ্য হওয়ার আইডিয়াটা তোমার?

- জ্বি।

- কেন অদৃশ্য হতে চাইলে?

- ইয়ে বলা একটু ...

- আচ্ছা ঠিক আছে বলতে সমস্যা হলে বলার দরকার নেই। ঐ রাতের ঘটনাটা একটু বল... তোমরা দুজন সাইকেল নিয়ে গিয়েছিলে?

- জ্বি।

- সাইকেলটা কই?

- টিপুর কাছে

- টিপু কে?

- আমাদের ক্লাশমেট। ওর কাছ থেকে সাইকেলটা ধার করেছিলাম এক রাত্রির জন্য।

- আচ্ছা। তোমার নিজের সাইকেল নেই?

- ছিল চুরি হয়ে গেছে।

- তোমরা যে মহিলাটাকে বাঁচালে সে শেষ পর্যন্ত কোথায় গেল?

- কেন উনিতো উনার বাসায় চলে গেলেন...

- ঠিক ক'টায়?

কথা বলতে বলতে মুশফিকের গলা শুকিয়ে যায়। একসময় পানি খেতে চাইলে তাকে পানি দেয়া হয়।

- আর কিছু খাবে?

- না

- চা সিঙ্গারা অন্য কিছু? ড্রিঙ্কস?

- জ্বি না।

- তোমাদের এই এ্যাডভেঞ্চারের কথা কেউ জানে? বাবা- মা বা বন্ধুরা?

- না, তবে টিপু জানে

- টিপুকে কে বলেছে? তুমি ?

- না বাদল।

- তুমি বাদল?

- জ্বি।

- চিতায় কেরোসিন ঢালার বুদ্ধিটা কার?

- ইয়ে আমারই।

- ঐ শ্মশানে ক'জন মানুষ ছিল ?

- তিন জন।

- চিতায় আগুন দেওয়ার সময় লোকটার গায়ে আগুন তুমি দিয়েছিলে?

- না না ...

- তাহলে লোকটার গায়ে আগুন কিভাবে লাগল?

- লোকটা চিতার একদম কাছে ছিল ... তাই হঠাৎ লেগে গেল। লোকটা কি মরে গেছে?

- না তবে হয়ত মরবে। বার্ন ইউনিটে আছে ...৮০% বার্নড

- যে মহিলাকে তোমরা বাঁচিয়েছ তাকে আগে থেকে চিনতে?

- জি না

- তাহলে বাঁচাতে গেলে কেন?

- আমরা গিয়েছিলাম ... থেমে যায় বাদল

- বল

- মানে আমরা শ্মশানে গিয়েছিলাম অন্য একটা কাজে ...

- সেই কাজটা কী?

বাদল কেশে গলা পরিষ্কার করে প্রথম থেকে শুরু করে। সেই মুশফিকের অদৃশ্য হওয়ার ইচ্ছা থেকে। তবে সে যে মাঝখানে অদৃশ্য হওয়ার জন্য সাধুর কাছে আগে গিয়েছিল বা সাধু যে মারা গেছে এগুলো চেপে যায়।

টানা তিন ঘণ্টা পর ওদের ছেরে দেয়া হয়। তারা ভেবেছিল। পুলিশরা ওদের পৌছে দিবে স্কুলে সেরকম কিছু হলো না। ওরাই একটা রিক্সা নিল স্কুল পর্যন্ত অবশ্য থানা থেকে স্কুল খুব বেশি দূরে নয়। রিকসায় যেতে যেতে দুজনেই বেশ চিন্তিত বোধ করল। তাদের গার্জেনরা জেনে গেলে কি হতে পারে বিষয়টা স্কুলে জেনে গেছে এটাও কম বিপদজনক নয়।

- চল স্কুলে গিয়ে টিপুকে একটা ধোলাই দেই।

- কেন?

- ঐতো বিষয়টা স্কুলে ফাঁস করল।

- পরে স্যারকে বলে দিবে তখন?

- আরে রাখ... ঐ শালার জন্য ... দাঁত কিড়মিড় করে বাদল। মুশফিক অবশ্য অন্য কিছু ভাবে। সোহেলকে একটা ধোলাই দিলে মন্দ হয় না। ঐ আসল ক্রিমিন.ল। ওর জন্যইতো সে অদৃশ্য হতে চাইল ... তারপর থেকে যত ঝামেলার শুরু।

চিন্তিত মুখে ওরা যখন স্কুলের গেটে পৌঁছাল। তখন টিফিনের ঘণ্টা ঢং ঢং করে বাজল। তখনই চিন্তাটা মাথায় এল প্রথমে বাদলের।

- শোন মুশফিক আমার মনে হয় আমাদের আজ আর স্কুলে যাওয়া ঠিক হবে না।

- কেন?

- গেলে হেড স্যার ধরতে পারে।

- তাও ঠিক। কিন্তু আজ হোক কাল হোক হেড স্যারতো ঠিকই ধরবে আমাদের, পুলিশ যখন এসেছে স্কুলে আমাদের কাছে।

- এর চেয়ে চল আমরা ঐ মহিলার বাসায় যাই। আমাদের অনেক করে যেতে বলেছিল আজ । আর পুলিশের ব্যাপারটাও তাকে জানানো উচিত।

তা মন্দ বলিস নি । ঠিকানাটা আছে তো?

- মুখস্থ ২৭/ ৮ দক্ষিণ কাফরুল

- তাই চল।

বাড়ির নাম নোঙর

বাড়ির নেম প্লেটে লেখা আছে ২৭/ ৮ দক্ষিণ কাফরুল। উপরে প্যাঁচানো অক্ষরে লেখা ' নোঙর' । বাড়িটা আলিসান। বাড়িটা দোতলা না তিনতলা চট করে বোঝা যায় না। সামনে একটা স্পাইরাল সিড়ি। নিচে বিশাল একটা এ্যাকুইরিয়াম। । সেখানে নানান রকম মাছ ছোটাছুটি করছে।

- এই বাড়ি তুই শিওর?

- কি করে বলব? আমি কি আগে এই বাড়িতে এসেছি নাকি?

- তখনি একটা লোক বেড়িয়ে এল।

- কি চাও তোমরা ?

- এটা মিসেস রুমানা'র বাড়ি ?

- হু। উনার সঙ্গে দেখা করবে?

- জ্বি । উনি আমাদের আসতে বলেছিলেন।

একটু অপেক্ষা কর। বলে লোকটি উধাও হয়ে গেল। ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে মাছ দেখতে লাগল।

বেশ অনেকক্ষণ পর লোকটা এল।

- এস আমার সঙ্গে। বলে ওদের ডাকল। ওরা লোকটার পিছু পিছু গেল। পিছনের আরেকটা সিঁড়ি দিয়ে ওরা দোতলায় গেল। একটা বড় রুমে নিয়ে ওদের বসানো হল।

একটু পরেই এলেন হাসি খুশি সেই মহিলা। অথচ সেই রাত্রে কি অবস্থা ছিল উনার।

- ও তোমরা এসেছ বস বস। তারপর কি খাবে বল। বলেই কি সব খাবার দিতে বলল ফোনে । তারপর তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ঘুরে তাকালেন তাদের দিকে। তখনই ওরা চমকে গেল। এই মহিলা সেই মহিলা নয়। ঐ

মহিলার মতোই কিন্তু ঐ মহিলা নয়। ইনি কিছুতেই রুমানা নয়। কিছুতেই না। অনেক মিল আছে হয়ত। কিন্তু উনি নন। গলার স্বরটাও অন্যরকম...

- সত্যি ঐদিন তোমরা না থাকলে কি যে হত। আমাকে ওরা মেরেই ফেলত। বলে মহিলা দরজার দিকে তাকাল। দড়জায় যে লোকটা দাঁড়িয়ে তাকে দেখে চমকে উঠল ওরা দুজন । আরে কি আশ্চর্য এই লোকটাইতো ঐ দুজনের একজন। স্পষ্ট মনে আছে তাদের। চিতার আগুনের আলোয় এই লোকটার মুখটা অন্তত মনে আছে লোকটার চিবুকটা ছোট। প্রায় নাই বললেই চলে। আর মাথায় চুল কম। এই লোকের চেহারা ভোলার কথা নয়। কোনো কারণ ছাড়াই কেমন যেন ভয় লাগল মুশফিকের। মুশফিক তাকিয়ে দেখে বাদলের মুখও শুকনো। ব্যাপারটা সে ধরতে পেরেছে।

- আমরা তাহলে আজ আসি।

- সে কি কেন নাস্তা আসছে, খাবে দাবে।

- না না দরকার নেই।

- আহা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। সত্যি সেদিন তোমরা না থাকলে কি যে হত তাই না মিজান? বলে মহিলাটা মিজানের দিকে তাকায়। মিজান নামের সেই লোকটা রোবটের মতো মাথা নাড়ে।

একটু বাদেই একটা ট্রেতো করে দু গ্লাস কোক এল। গ্লাসদুটো লম্বা ভেতরে বেশ অনেকটা কোক, একটা করে বরফের টুকরো ভাসছে।

- নাও আগে একটু গলা ভেজাও নাস্তা আসছে। বেশ তৃষ্ণা পেয়েছিল। দুজনেই ঢগ ঢগ করে খেয়ে ফেলল কোকটা। রবীনের কাছে কোকের স্বাদটা একটু অন্যরকম লাগল। মুশফিকের কাছেও তাই মনে হলো কেমন একটা অষুধ অষুধ গন্ধ।

ওরা খেয়াল করল মহিলা কেমন হাসি হাসি মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। আর দরজায় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সেই মিজান নামের ভয়ঙ্কর লোকটা। একটু আগেও লোকটাকে অত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল না। এখন কেমন যেন ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। হঠাৎ বাদলের মনে হল ওখানে দরজায় একটা না দুটো লোক দাঁড়িয়ে আছে, দুজন মিজান। আর মুশফিকের মনে হলো ঐ মহিলাও এখন আর একজন নয় দুজন... দুজন মহিলা তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। সেই দুজন মহিলা আর যেই হোক সেই শ্মশানের মিসেস রুমানা নয়।

মুশফিক-বাদল দুজনের চোখের পাতাই ভারী হয়ে আসছে তারা দুজনের কেউই বুঝতে পারল না যে তাদের হাই ডোজ এর ঘুমের অষুধ খাওয়ানো হয়েছে। তারা দুজনেই চেয়ার থেকে পরে যাওয়ার মুহূর্তে মিজান লোকটা ছুটে এসে ধরে ফেলল। তারপর দুজনকে এক সঙ্গে পাজা কোলে করে ধরে উঠে দাঁড়াল । তাকাল মহিলার দিকে। মহিলা ভ্রু ভঙ্গি করলেন যার অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে। মিজান নামের লোকটা ওদের পাজাকোলে করে নিয়ে পাশের একটা ঘরে চলে গেল। মহিলা এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে ফোন করল একটা বিশেষ নাম্বারে। মহিলার গলাটা এখন বেশ মোটা অনেকটা পুরুষালী।

- হ্যালো?

- (ওপাশে কি কথা হলো কে জানে)

- হ্যাঁ ছেলে দুটোকে পাওয়া গেছে। হু হু ... ওরা নিজের থেকেই এসেছিল। ঐ রুমানাই ঠিকানা দিয়েছিল হয়ত।

- (ওপাশে কি কথা হলো কে জানে)

- যা করার মিজানই করবে। হ্যাঁ আজই ... প্রমাণ রাখা যাবে না।

- (ওপাশে কি কথা হলো কে জানে)

- হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই ভালো।

- (ওপাশে কি কথা হলো কে জানে)

মহিলা ফোন রেখে অভিজ্ঞ পুরুষ মানুষদের মতো সিগারেটের ধোয়া ছাড়ল। ধূয়াটা একটা রিং-এর মতো ঘুরতে ঘুরতে উপরের দিকে উঠতে লাগল। রিংটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই নোঙর বাড়িটি থেকে একটা সাদা মাইক্রো বেরুল। মাইক্রোর ভেতর দুটো বস্তা তার ভেতর দুজন কিশোর। একজন মুশফিক আর একজন বাদল। দুজনেই গভীর ঘুমে অচেতন!

- ছেলে দুটা মরছেতো?

- এহনো মরে নাই তবে মরব। মেঘনায় বস্তা পড়লেই টুপ করে ডুবে গিয়ে ফুস করে প্রান বায়ুটা বের হয়ে যাবে। তোর কি মনে হয় অজ্ঞান মানুষ সাঁতরাইতে পারে?

- ক্যামনে কমু । গাড়ি চালাতে চালাতে বলে ড্রাইভারের আসনে বসা লোকটা। ঐ লোকটাই ঐ দিন শ্মশানে গাড়ি চালিয়ে পালিয়েছিল।

- আর এরা সাঁতার জানে না।

- কেমনে বুঝলা সাঁতার জানে না।

- আরে বেকুব এই শহরে কোনো পুকুর আছে ? পোলাপান সাঁতার শিখব কোন খানে?

- তাও কথা... তবে সাঁতার জানলেও লাভ নাই

- ক্যান?

- বান্ধা বস্তার মধ্যে সাঁতরাইব ক্যামনে? নিজেদের রসিকতায় দুজনেই হেসে ওঠে ।

ওদের গাড়ি ছুটছে যমুনা ব্রিজের দিকে । আজ শনিবার জ্যাম একটু কম । চারিদিকে আধার হয়ে আসছে । কাজটা সারতে হবে অন্ধকারে ।

যমুনা ব্রীজ থেকে ঝপাং ঝপাং করে দুটো মুখ বাধা বস্তা পড়ল মেঘনায় । আশে পাশে কেউ টের পেল না । বস্তা দুটো তলিয়ে গেল নিচের দিকে ।

সাদা মাইক্রোটা দেরী করল না দ্রুত ছুটল শহরের দিকে ।

ব্রীজটার তল দিয়ে একটা পানসি নৌকা এগিয়ে আসছে ছপ ছপ শব্দে ।

বস্তাদুটোর মুখ বাধা ছিল বলে ভেতরে বাতাস আটকে ছিল, আর তাই ফেলা মাত্র তলিয়ে গিয়েও ডুবে গেল না একটু ক্ষণের জন্য ভেসে রইল আর তখনই একটা পানসি নৌকা এসে ধাক্কা খেল বস্তা দুটোয়।

নৌকার মাঝি নৌকা থামিয়ে হাত দিয়ে টের পেল দুটো বস্তাকে। তার কিছু একটা সন্দেহ হলো। টেনে তুলল দুটো বস্তাই। দ্রুত মুখ খুলতেই বের হয়ে এল দুই কিশোর!

- ইয়া মাবুদ এইসব কি দেখতাছি...!!

নদীতে ডুবে যাওয়া মানুষকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় জানে বুড়ো মাঝি সে দ্রুত ব্যবস্থা নিল।

সে যাত্রায় রক্ষা পেল বাদল আর মুশফিক। তাদের জ্ঞান ফিরল সেই বুড়ো মাঝির ঘরে। তাদের ঘিরে আছে সবাই। সবাই চোখ গোল গোল করে দেখছে। হ্যারিকেনের টিম টিমে আলোয় মুশফিক পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। উঠে বসতে গিয়ে টের পায় সারা শরীরে ব্যথা। পাশে বাদল তখনও হা করে ঘুমুচ্ছে। নাকি এখনো অজ্ঞান হয়ে আছে কে জানে। তাদের রক্ষাকারী বুড়ো মাঝিটা তখনও গল্প বলে যাচ্ছে তাদের নিয়ে... লোমহর্ষক গল্প...

... আমি দেখলাম ব্রিজের উপর থাইকা একটা সাদা মাইক্রো কিছু ফেলাইল। ঝুপ ঝুপ শব্দ হইল। তখন বেইল নাইমা গেছে চারিদিকে আন্দার। আমার পানসি গিয়া বারি খাইল দুইডা বস্তার মধ্যে। আমি কই ... কিরে কি করি...বস্তা দুইটায় হাত দিয়াই টের পাইলাম ঘটনা খারাপ। টান দিয়া দুই বস্তা উঠাইলাম নৌকায়... কিরে কি করি...

মাঝির গল্প শুনতে শুনতে মুশফিক বুঝতে পারল বুড়ো মাঝির একটা মুদ্রা দোষ আছে কিছুক্ষণ পর পর বলে ' কিরে কি করি? ' অন্য সময় হলে সে হেসে ফেলত। এখন হাসতে পারছে না। পরিস্থিতি হাসার মতো নয়।

মুশফিক শুয়ে শুয়ে পুরা ঘটনাটার একটা ছবি নিজের মধ্যে একে ফেলল...

তারা ঐ মহিলার বাড়িতে গেলে তাদের কিছু একটা খাওয়ানো হয়। তারপর তারা অজ্ঞান হয়ে পরে। পরে তাদের বস্তায় ভরে ফেলে দেয় মেঘনায়... আর এই বুড়ো মাঝি তাদের বাঁচায়। পুরো ব্যাপারটা ভেবে ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে মুশফিক। হঠাৎ বাদল উঠে বসে।

- আমরা কোথায়?

তার কথায় ঐ ঘরের লোকজন তাদের দিকে ফিরে তাকায়

- হ হ পোলা দুইটার জ্ঞান ফিরছে... মাশাল্লাহ।

- আমরা কোথায়? আবার বলে বাদল। তখন হাচরে পাচরে উঠে পড়ে মুশফিকও। কোনো মতে বলে 'ঐ চাচা মনে হয় আমাদের বাঁচিয়েছেন।' তখন চাচা মিয়া হাসি মুখে তাদের দিকে এগিয়ে আসে।

- হ আমিই তোমাগো বাঁচাইছি...

এ সময় এক মহিলা এগিয়ে আসে দুটো কাসার গ্লাসে করে দুই গ্লাস গরম দুধ দিয়ে বলে

- খাও বাজানরা খাও। শইল্লে বল আইব। এই তোমরা এল্লা যাও সকালে আইও। বলে ভীড় করা অন্যদের হাকিয়ে দেয়। শুধু একজন বসে থাকে। সম্ভবত সে এই বুড়োমাঝির কাছের কেউ হবে।

- দুধটা খাও এক চুমুকে। হুকুমের সুরে বলে মাঝি। তারা দুজনেই খায় পুরোটুকু। বাসায় হলে ঘ্যান ঘ্যান করত, অথচ এখন খেল এবং ভালোই লাগল। আর সত্যিই যেন সঙ্গে সঙ্গে একটু শক্তি শক্তি লাগে শরীরে। দুর্বল ভাবটা কাটিয়ে ওঠে মানসিকভাবে!

- এইবার কাহিনীডা কও দেহি... কি বিত্তান্ত। বুড়া মাঝি হ্যারিকেন উঁচু করে ধরে বলে।

মুশফিকই শুরু করে...

... একটা বাসায় গিয়েছিলাম, ওখানে সরবৎ খাওয়াল তারপর আর মনে নেই।

- গুমের অষুধ খাওয়াই মনে হয় অজ্ঞান করছে। পাশে বসা লোকটা বলে।

- কিন্তু নদীতে ফেলব কেন? কি অপ্রাদ ওগো?

- পিছনের ইস্টরী আছে মনে কয়। বিজ্ঞের মতো বলে পাশের জন।

এই সময় সেই মহিলা আবার আসে। দুই হাতে দুই থালা।

- ইস্টরী মিস্টরী পরে হইব নে এই নেও খাও। খাইয়া একটা ঘুম দেও। সক্কালে উইঠা ওগো একটা ব্যবস্থা কইরেন। তয় হারাম এক খান কথা কই

- কও? বুড়ো মাঝি বিড়ি ধরায়।

- হারাম কইলাম পুলিশে খবর দিয়েন না।

- ক্যা?

- মনে নাই সেইবার নদী থাইকা এক লোকের লাশ আনলেন তারপর পুলিশ...

- ওহ ঐ কথা আর কইও না বিবি... আমার শিক্ষা হয়া গেছে। এই আলোচনায় পাশের বৃদ্ধটি অংশ নিল না। সে বির বির করে বলতে লাগল ' কার্তিক মাস যায়গা এহনও শীতের দেহা নাই ...' আরো কি সব বির বির করে বলে উঠে চলে গেল বিড়ি টানতে টানতে।

প্রচন্ড ক্ষিধে পেয়েছিল ওদের । কাসার থালায় এমন মজার ভাত তারা খায় নি আর কখনো , মোটা লাল ভাত পাশে অর্ধেকটা ডিম আলু আর ঝোল... এক পাশে একটু ভাজি। অমৃতের মতো লাগল দুজনের। ভাত শেষ করে ঠাণ্ডা পানি খেল টিউবওয়েলের, আরো ভালো লাগল। মহিলাটা এঁটো থালা নিয়ে গেল। এবং তাড়া লাগাল এক্ষুণি ঘুমাতে। বুড়োও উঠে পড়ল সকালে কথা হবে, এবং একটা ব্যবস্থা হবে বলে। মহিলাটা ঘরের বেড়ার দরজাটা টেনে দিল। শক্ত মাদুরের বিছানায় পাশা-পাশি শুয়ে বাদল আর মুশফিকের কেমন অদ্ভুত অনুভূতি হল। পাশেই বেড়ার একটা অংশ চারকোনা করে কাটা ওটাই জানালা সেই জানালা দিয়ে আস্ত একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে তার নিচে চক চক করছে রূপালি নদী। কি অপূর্ব দৃশ্য। বাদল ফিস ফিস করে বলল-

দেখ কি সুন্দর!

হ্যাঁ দেখছি ... ফিস ফিস করে মুশফিক।

বাকি জীবনটা এই ঘরটায় কাটিয়ে দিলে কেমন হয় বলতো? বাদল ভাবের ঘোরে বলে।

দারুণ।

তাদের মনে রইল না যে তারা একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে গেছে। একটা জটিল দল তাদের মেরে ফেলতে চাইছে। মেরেও ফেলেছিল প্রায়। ভাগ্যগুণে রক্ষা পেয়েছে। তাদের মনেই রইল না তাদের বাসায় বাবা মা কি ভাবছেন তাদের নিয়ে চিন্তা করছেন কিনা আদৌ।

চাঁদ আর নদীর অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে দুজনেই যে কখন ঘুমিয়ে গেল টের পেল না।

ঘুমিয়ে দুজনেই দুটো স্বপ্ন দেখল। মুশফিক দেখল সে জেনিফারদের বাসায় গিয়ে কড়া নারছে। জেনিফার বাবা দরজা খুলেছে।

- কাকে চাই?

- জেনিফার আছে?

- আছে তবে ও তোমার সঙ্গে দেখা করবে না।

- কেন?

এই সময় মুশফিক দেখল জেনিফার পেছন থেকে ছুটে আসছে। বলছে আমি ওর সঙ্গে কথা বলব ওদের অনেক বিপদ... বিপদ...

আর বাদল দেখল স্কুলের হেড স্যার তাকে টিসি দিয়ে দিয়েছেন। সেই টিসির কাগজ নিয়ে বাইরে এসে দেখে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। স্কুলের পাশের ড্রেন দিয়ে হুরমুর করে পানি ছুটছে। বাদলের কি হলো টিসি'র্ কাগজটা দিয়ে একটা নৌকা বানিয়ে ভাসিয়ে দিল সেই ড্রেনে। পেছন থেকে জেনিফার চিৎকার করে বলল-

- এই বাদল তোকে ডাকে?

- কে ডাকে ?

- হেড স্যার

- কেন?

তোকে ভুল করে টিসি দিয়েছে। টিসি'র কাগজটা ফেরৎ দিতে বলছে হেড স্যার।

হায় হায় তখন বাদল টিসির কাগজ দিয়ে বানানো নৌকার পিছনে ছুটতে লাগল ... নৌকাটা সাই সাই করে ছুটছে ড্রেনের ঘোলা জল দিয়ে ... বাদল ধরতেই পারছে না।

দুজনেই জেনিফারকে স্বপ্ন দেখল কেন?

পরদিন সেই বুড়ো মাঝির থেকে বিদায় নিতে বেশ কষ্টই হলো মুশফিক আর বাদলের। বুড়ো মাঝি আর তার স্ত্রীকে কথা দিয়ে আসতে হলো তারা আবার আসবে। এবং পৌঁছে ফোনে জানাবে। মাঝির নিজের মোবাইল ফোন নেই এলাকার একজনের মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিয়েছে। সেটাতে ফোন করে বলতে হবে 'কেরামত মাঝিরে খবর দেন'

কেরামত মাঝি তাদের পকেটে একশ টাকা গুজে দিয়েছে। এবং বাসেও উঠিয়ে দিয়েছে। এখন চিনে যেতে পারলেই হয়। আসলেই মানুষ কত ভালো হয়। একজন তাদের ডুবিয়ে মারতে চাইল একজন বাঁচিয়ে তুলল। জীবন বোধহয় এমনই। দুজন বাসের জানাল পাশে বসে উদাস হয়ে ভাবে।

আটটায় রওনা দিয়ে দুপুর বারোটা নাগাদ তারা পৌঁছে যায় তাদের পাড়ার বাস স্ট্যান্ডে। তারা দুজনেই ভেবেছিল গত রাতে না থাকায় নিশ্চয়ই বাসায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটবে কিন্তু কি আশ্চর্য বাদলের বাসায় মা ধমক দিল 'এই শয়তান রাতে মুশফিকের বাসায় থাকবি একটা ফোন করে জানালে হত না?'

ভাগ্য ভাল বলতে হবে। তারা ধরেই নিয়েছে রাতে আসে নি মানে মুশফিকের বাসায় আছে। এমনটা আগেও হয়েছে। কিন্তু সেটা জানিয়েছে ফোনে। এবারতো অন্য কেস।

মুশফিকের বাসায় অবশ্য তেমন কোন সমস্যা হলো না। মুশফিকের মামা ভ্রু কুচকে বলল কিরে কাল রাতে তোকে দেখলাম না মনে হলো? কোথায় ছিলি?

- ইয়ে মামা... কিছু একটা বানিয়ে বলতে যাবে তার আগেই মামা ফের পত্রিকার খবরে ডুবে গেলেন। খালি বললেন ' যাতো চট করে দোকান থেকে লিকার চা আন আমার জন্য আর একটা গোল্ডলিফ...'

মুশফিক ছুটে যায় দোকানে চা আর সিগারেট আনতে।

যেহেতু সে ব্যাচেলর মামার সাথে থাকে কাজেই তাদের বাসার সিসটেমটা অদ্ভুত। একটা বুয়া একদিন পর পর এসে রান্না করে দিয়ে যায়। তারা ফ্রিজে রেখে রেখে খায় মানে মামা আর ভাগ্নে। মামা বিয়ে করেন নি বলেই যত ঝামেলা মামা অবশ্য অফিসিয়ালী জানিয়ে দিয়েছেন তিনি বিয়ে করবেন না। সারাদিন হয় বই পড়েন নাহলে পত্রিকা পড়েন। নতুন পত্রিকাতো পড়েনই খুটিয়ে খুটিয়ে পুরান পত্রিকাও পড়েন। একদিন মুশফিক প্রশ্ন করে বসল

- মামা তুমি পুরান পত্রিকা কেন পড়?

- কিছু কিছু খবর আছে বুঝলি নতুন পত্রিকায় পড়তে ভয় লাগে। সেরকম খবর আমি ক'দিন পরে পড়ি।

- যেমন ধর সাগর-রুনীর হত্যার খবরটা। কি কষ্টের একটা খবর ওদের একটা ছোট্ট সুন্দর বাচ্চা আছে । বাচ্চাটা একা হয়ে গেল। ওর বাবা-মাকে পিশাচরা মেলে ফেলল এই খবর কি পড়া যায়? বরং পরে পড়ি বাচ্চাটা কষ্টটা একটু সামলে উঠুক। অপরাধীরা ধরা পড়ুক...

মুশফিক ঠিক বুঝতে পারে না মামাকে, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মামার সব ব্যাখ্যাই অন্যরকম। মাঝে মাঝেই বড়দের ব্যাপার নিয়ে মামা তার সাথে গুরুগম্ভীর আলাপ জুড়ে দেয়। যেমন আজ সকালে হঠাৎ বলল

- আচ্ছা তোর কি মনে হয় তানভীর দোষী?

- কোন তানভীর?

- আরে ঐ যে হলমার্কের এমডি না কি যেন... চারহাজার কোটি টাকা নিল সোনালী ব্যাংক থেকে।

- ও আচ্ছা। না বুঝেই বলে মুশফিক

- আরে বাবা ব্যাংক থেকে টাকা বের করা এত সোজা? আমি একবার ব্যাংক লোন নিয়ে ব্যবসা করার পরিকল্পনা করেছিলাম। ব্যাংক থেকে টাকাই বের করতে পারলাম না। আর মিঃ তানভীর চার হাজার কোটি টাকা বের করে নিল? পিস্তল ধরে ডাকাতিতো করে নি ব্যাংক থেকে। কাগজপত্রের মাধ্যমে টাকা বের করেছে... তাহলে? ওকে টাকাটা দিল কারা? কিভাবে দিল? কেন দিল ?

- ইয়ে মামা স্কুলে দেরী হয়ে যাচ্ছে

- এ্যাঁ তোর ইস্কুল আছে ? যা যা ...

পরদিন স্কুল বন্ধ। তারা দুজন স্কুলের মাঠে চলে এল। সময়টা বিকাল। স্কুলের মাঠের কোনার দিকের ওয়ালটা নিচু। ওখানে দুজনে পা ঝুলিয়ে বসে কথাবার্তা বলে প্রায়ই। অন্য সময় অন্য ছেলে-পেলেরা থাকে আজ কেউ নেই। তারা দুজন।

- আমার মনে হয় ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো দরকার।

- কোনটা ?

- এই যে আমাদের মেরে ফেলতে চাইল ঐ বাড়ির লোকজন। পুরো ব্যাপারটা পুলিশের ঐ অফিসারটাকে খুলে বলা দরকার।

- কেন?

- বাহ আসল মহিলাকে তো খুঁজে বের করতে হবে তার কোনো বিপদ হলো কিনা।

- তা ঠিক।

- তাছাড়া পুলিশ অফিসার কিন্তু বলেছিলেন কোনো তথ্য পেলে তাদের জানাতে।

- আমাদেরকে যে বস্তায় ভরে মেরে ফেলতে চাইছিল এটা বলব?

- কেন নয়?

- হুম... তাহলে চল।

- এখন যাবি?

- হ্যাঁ এখনি।

- বেশ।

পুলিশ ইন্সপেক্টর শান্ত ভঙ্গিতে তাদের দুজনের কথা শুনলেন। ধৈর্য ধরে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন

- তোমাদের বস্তায় ভরে ফেলে দিয়েছিল মেঘনায়?

- জ্বি।

- ফাজলামো কর আমার সাথে?

- জ্বি মানে?

- মানে আমার কাছে জি বাংলার কাহিনী শোনাও... এই সেন্ট্রি ? হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর।

একজন পুলিশ কনস্টেবল ছুটে এল।

- জ্বি স্যার।

- এই ছোরা দুটাকে লকআপে ঢোকাও...

এক সময় লক-আপের ভেতর আবিষ্কার করল নিজেদের বাদল আর মুশফিক। তারা দুজন ছাড়াও একটা লোক বসে ছিল। চুল দাড়ি সব বড় বড় জিনসের একটা ময়লা প্যান্ট পড়া। আর একটা সাদা হাফ হাতা শার্ট। পেন্ট যেমন ময়লা শার্টটা তেমনই পরিষ্কার। লোকটা ওদের দেখে মুচকি মুচকি হাসছিল। যেন ওদের লক-আপে ঢোকানোতে সে যথেষ্ট মজা পেয়েছে। তার এক হাতে সিগারেট। তবে সিগারেটটা নেভানো। ওদের কাছে এগিয়ে এল লোকটা।

- আমি ইরফান আলী। তোমরা?

- আমি বাদল।

- আমি মুশফিক। দুজনেই শুকনো গলায় বলে। লোকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বলল

- ভয়ের কিছু নেই। তোমরা আমাকে গল্পটা বল ...প্লিজ

- মানে কোন গল্প?

- আরে এই যে তোমরা কেন এখানে ঢুকলে মানে কেন ঢুকানো হলো তোমাদের?

মুশফিকের কেন যেন মনে হলো লোকটাকে বলা যায়। সে বলতে শুরু করল।

- মানে হয়েছে কি... এই পর্যন্ত বলে মুশফিক থামল আর তখন লোকটা বলে উঠল

- সেই শ্মশান থেকে বলা শুরু কর। মুশফিক বাদল দুজনেই চমকে তাকাল তার দিকে। লোকটা মিটি মিটি হাসছে।

- আপনি কি করে বুঝলেন আমরা শ্মশানে গিয়েছিলাম?

- সেটা পরে শোনা যাব গল্পটা বল আগে...

শ্মশান এর ঘটনা থেকেই শুরু করল মুশফিক। লোকটা হাটুর উপর তার দাঁড়িয়াল থুতনী রেখে গভীর মনোযোগে শুনতে লাগল...

বাদল দু' একবার চিমটি কেটেছে মুশফিককে তার মানে বলিস না। কিন্তু মুশফিক গড় গড় করে বলতেই লাগল। এ যেন বলে একটু হালকা হওয়া। লোকটা শুনছিল আর মাঝে মাঝে ফিস ফিস করে বলছিল -

'কি কোইনসিডেন্স! ... কি কোইনসিডেন্স!!'

সবটা শুনে ইরফান আলী নামের রহস্যময় লোকটা ঝিম মারল। চোখ বুজে কি ভাবল তর্জনী দিয়ে মেঝেতে আঁকি-বুকি কাটল তারপর মাথা নাড়িয়ে বলল-

- আমি মনে হয় বুঝতে পেরেছি।

- কি বুঝতে পেরেছেন?

- ঐ মহিলাটা কোথায় আছে?

- কোথায়?

- ঐ বাড়িতেই।

- কোন বাড়িতে?

- যে বাড়িতে তোমাদের ঘুমের অষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করা হলো।

- কি করে বুঝলেন ?

- কিছু কিছু জিনিস আমি বুঝতে পারি। সিক্সথ এন্ড হাফ সেন্স বলতে পার। যেমন করে তোমাকে একটু আগে বললাম শ্মশান থেকে শুরু করো তোমরা চমকে উঠলে।

- সিক্সথ এন্ড হাফ সেন্স মানে?

- আরে সিক্সথ সেন্স অনেকেরই থাকে আমার অতিরিক্ত হাফ সেন্স আছে ... হে হে হে

বলে ইরফান আলি অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল।

- আচ্ছা সত্যি কি ভাবে বললেন আপনি ?

- কোনটা?

- ঐ যে শ্মশানের ব্যপারটা।

- শোন সময় কম। এসব ব্যাপারে পরেও কথা বলা যাবে। এখনি ওসি সাহেব আসবে আমাকে চালান করে দিতে পারে। তার আগেই তোমাদের বলি। তোমরা আজ এখান থেকে বেড়িয়ে ঐ বাসারটার সামনে যাবে। শুধু লক্ষ্য করবে বাসাটার নিচে ভিতের ইটের গাঁথুনিতে কয়টা ইট যদি ছয়টার

কম হয় তাহলে ঐ বাসার নিচে একটা বেজমেন্ট আছে ওখানেই তোমরা সেই মহিলাকে খুঁজে পাবে।

- কিন্তু আমরা এখান থেকে বের হব কিভাবে?

- একটু পরেই বের হবে...

- কিভাবে ?

- দেখ না। বলে লোকটা সিগারেট টানতে লাগল। ওরা দুজনেই চমকে উঠল। সিগারেটটা নেভানো ছিল জ্বলে উঠল কিভাবে?

আর ঠিক তখনই ওসি সাহেব ঢুকলেন। লক-আপের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়। ইরফান আলী চেচিয়ে উঠল

- স্যার আপনাকে ওরা দশ হাজার কম দিয়েছে গুনে দেখুন।

ওসি থমকে দাঁড়ালেন। তীব্র চোখে তাকালেন ইরফান আলী'র দিকে। তারপর পকেটে হাত দিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই আবার এলেন। লোকটা হাসিমুখে বলল

- স্যার ঠিক বলছি না?

ওসি সাহেব কথা বললেন না। অনেকটা হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে রইলেন ইরফান আলী'র দিকে। ইরফান আলী তখন বেশ দৃঢ় স্বরেই বলল-

'ওসি সাহেব বাচ্চা দুটোকে এখনি বের করে দিন....'

ওসি সাহেব কনেস্টবলের দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই কনেস্টবল লক-আপ খুলে ওদের বাইরে আসতে বলল।

ওরা দুজন বাইরে এসে ফিরে তাকাল। ইরফান আলী হাত নাড়ল চেচিয়ে বলল ' যাও যাও দেরী করো না আবার আমাদের দেখা হবে...'

দেড় ঘণ্টার মতো ওরা ছিল লকআপে। বাইরে এসে মনটা ভালো হয়ে গেল। আহ্ মুক্তি।

- কাজটা কি ঠিক হলো?

- কোনটা?

- এই যে আমরা জেল খাটলাম।

- জেল না এটাকে বলে হাজত বাস। একটা অভিজ্ঞতা হল মন্দ কী?

- খবরদার কাউকে বলবি না।

- কেন বললে কি হবে?

- বাহ ক্লাস এইটে পড়ার সময় আমরা হাজত বাস করলাম এটা খুব ভালো হলো? কি বলছিস তুই ?

- তাছাড়া...

- তাছাড়া ?

- মানে জেনিফার সজল যদি জানতে পারে তাহলে কি সর্বনাশ হবে বুঝতে পারছিস?

জেনিফার- সজল প্রসঙ্গ আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ল মুশফিক!

- কি হল?

- হুম... তা ঠিক, চল ঐ বাড়িটায় যাই ।

- আজ না আজ বাসায় চল ।

- তাহলে তুই যা । আমি একটু ঘুড়ে আসি ।

- তুই একা যাবি?

- যাই ... এখন বাসায় গেলে মামা ঘুমাতে বলবে এর চেয়ে খোঁজ নিয়ে আসি দেখি বাড়ির ভেতের ইটের গাঁথুনীতে ইট আসলে ঠিক কয়টা?

- কিন্তু তোকে চিনে ফেললে?

- ওরাতো জানে আমরা মরে গেছি তখন ভাববে ভুত!

- দেখ ফাজলামো না এখন যাস না । কাল তুই আমি এক সঙ্গে যাব ।

- আচ্ছা চল ।

তারা দুজনেই বাড়ির দিকে হাটা দিল । বাসার মোড়ের কাছে এসে বাদল বিদায় নিল । মুশফিক কি মনে করে বাসায় না গিয়ে সিএন্ডবির দেয়ালে পা ঝুলিয়ে বসল । আর তখনি দেখল জেনিফার আসছে । জেনিফারের সঙ্গে সোহেল । ওরা নিশ্চয়ই কোচিং থেকে ফিরছে । মুশফিক কি করবে বুঝতে পারছে না । ওদের সঙ্গে একটা দূরত্ব হয়ে গেছে । ধুৎ বাদলের সঙ্গে চলে গেলেই হত ।

ওরা আসছে । কথা বলতে বলতে আসছে । এখনো তারা মুশফিককে দেখে নি । একটা গাছ ওদের আড়াল করে রেখেছে । গাছটা পেরুলেই ওরা দেখবে ।

গাছটা পেরুল ওরা দুজনেই দেখল মুশফিককে । না প্রথমে জেফিারের সাথে চোখাচোখি হলো । তারপর সোহেল দেখল দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে নিল । যেন দেখেনি মুশফিককে ।

কোন কারণ ছারাই মুশফিকের মনটা খারাপ হয়ে গেল ।

ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে লাফ দিয়ে নামল মুশফিক । তারপর হাটা দিল ঐ বাড়িটার দিকে । সে একাই যাবে । দেখা যাক না সত্যিই ঐ বাড়ির নিচের গাঁথুনীতে ইটের সারি কয়টা সে কি বুঝতে পারবে বিষয়টা?

ইরফান আলীর কথা মতো বাড়িটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করেও কিছু বুঝল না মুশফিক। বাড়ির ভিত, প্লাস্টার করা কি করে বুঝবে কয়টা ইটের গাঁথুনি? অর্থাৎ এই বাড়ির নিচে বেসমেন্ট আছে কি নেই। বেসমেন্টওলা বাড়ি থাকে বিদেশের বাড়ি ঘরে। বিদেশী গল্প উপন্যাসে পাওয়া যায়। এই বাড়িতে কি আছে বেসমেন্ট?

মুশফিক কি মনে করে বাড়িটার পিছন দিকে চলে গেল। পিছন দিকে একটা সরু রাস্তা গেছে। রাস্তার পাশে ছোট্ট খাল এখন যা একটা নর্দমায় রূপ নিয়েছে।

জায়গাটা নির্জন। তখনই কোত্থেকে ঘেউ ঘেউ করতে করতে একটা কুকুর ছুটে এল। ভয়ের চোটে লাফ দিয়ে দেয়ালটার উপরে উঠে গেল মুশফিক। কুকুরটা কিছুক্ষণ নিচে দাঁড়িয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ঘেউ ঘেউ করে চলে গেল। এখন কি করবে মুশফিক বুঝতে পারছে না।

কি মনে করে মুশফিক দেয়াল থেকে ঝাঁপ দিয়ে বাড়ির ভেতরেই নামল। দেখাই যাক না। ভিতরে একটা ঝাকড়া কাঠাল গাছ। তারপাশে ভাঙাচোরা টেবিল চেয়ার বাক্স। সে এগুলো টপকে সাবধানে এগিয়ে গেল। তার মাথায় ঘুরছে বেসমেন্ট। বেসমেন্ট থাকলে সেই মহিলা থাকবেন। হাজতের সেই রহস্যময় লোকটা এমনটাই বলেছিল। কিন্তু লোকটার কথাকেই বা সে কেন এত বিশ্বাস করছে কেন কে জানে!

এ সময় কিছু কথাবার্তা শুনতে পেল মুশফিক। এগিয়ে গেল কথাবার্তার শব্দ অনুসরণ করে। দেয়াল ঘেষে একটা একটা ঘর পাওয়া গেল তার জানালাটা খোলা। জানালাটার নিচে গিয়ে আস্তে করে উকি দিল। ভেতরে তিনটা লোক কথা বলছে।

তিনজনের দুজনকে সে চিনতে পারল সেই মাইক্রোর ড্রাইভার আর মাইক্রোর অন্য লোকটা... যারা তাদের দুজনকে নদীতে ফেলে দিতে গিয়েছিল।

তৃতীয় লোকটাকে চিনতে পারল না মুশফিক। তাদের কথাবার্তা শুনতে কান পাতল-

ওদের কথাবার্তায় যা বোঝা গেল... তারা সেই মহিলাকে নিয়েই আলাপ করছে। এবং তাকে যে এই বাসাতেই আটকে রাখা হয়েছে সেটাও বোঝা গেল। তার মানে এখানে বেসমেন্ট জাতীয় কিছু একটা আছে।

আচ্ছা ঐ পোলা দুইটা মরছেতো?

মুশফিক কান খাড়া করে। তাদের কথা হচ্ছে।

মইরা এতক্ষণে ভুত হইয়া গেছে।

আর তখনই ঐ তিনজনের কেউ একজন জানালার কাছে এল কিছু ফেলতে এবং দেখে ফেলল মুশফিককে! দেখেই লোকটা আর্তনাদ করে উঠল ভয়ে ' ও...মাগো! '

কি হইল?

ভুত!

ভুত??

হ পোলা দুইডার ভুত দেখলাম! হারাম... ঐখানে খারায়া আছে!

মুশফিক এর প্রচণ্ড হাসি পেল। ভয়ও লাগল। সে আর দেরী করল না। চট করে পিছিয়ে এসে দেয়াল টপকে বাইরে চলে এল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেছে। জেনিফারদের বাসার সামনে এসে তার হাটার গতি যেন একটু শ্লথ হয়ে গেল। মনে হচ্ছে জেনিফারদের বাসায় কোনো অনুষ্ঠান। বাইরে কম বয়সের ছেলে পেলে, মেয়েই বেশি। তাদের ক্লাশের দুয়েকজনকেও দেখা গেল। তখনই তার মনে হলো আজ জেনিফারের জন্মদিন। সোহেলকেও দেখা গেল হাতে একটা কোনো উপহারের প্যাকেট নিয়ে হন হন করে যাচ্ছে। মুশফিকের কি যে হলো সে সোহেলের পিছে পিছে জেনিফারদের বাসায় ঢুকে গেল। ভিড়ের মধ্যে সোহেল টের পেল না যে তার পিছে পিছে মুশফিক চলে এসেছে।।

জেনিফার এগিয়ে এসে সবার কাছ থেকে হাসিমুখে উপহার নিচ্ছে। একসময় সোহেলের দিকে হাত বাড়াল। সোহেলকে টপকে তার নজর গেল মুশফিকের দিকে। অবাক এবং গম্ভীর দুটোই একসঙ্গে হল যেন জেনিফার। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সোহেল পিছনে তাকিয়ে মুশফিককে দেখে বলল 'তুই? '

হ্যাঁ আমি জেনিফার বলল তাই এলাম।

জেনিফার ভ্রূ কুচকে তাকাল মুশফিকের দিকে। এই সময় জেনিফারের মা চেচিয়ে উঠলেন 'বাচ্চারা তোমরা সব এদিকে আস। কেক কাটা হবে... জলদি।'

জেনিফার এর কেক কাটা পর্যন্ত অবশ্য অপেক্ষা করল না মুশফিক। সে জেনিফারের অবাক (নাকি রাগী) চোখ এড়িয়ে এক ফাঁকে পিছিয়ে গিয়ে বেড়িয়ে এল। তার চলে যাওয়াটা কেউ খেয়াল করল না, অন্তত মুশফিকের তাই ধারনা।

বাসায় ফিরে খেয়ে দেয়ে ঘুম দিল। ভাগ্য ভালো মামা এখনো ফেরেন নি। ঘুমটা হলো নিশ্চিন্তে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল সে যেন জেনিফারের বাসায় আবার গিয়েছে। ওর মা বলল–

- এই তুমি মুশফিক না?

- জি খালাম্মা।

কেক না খেয়ে চলে গেলে কেন? এই নাও কেক খাও।

মুশফিক কেকটা খাচ্ছে যখন তখন পাশে এসে দাঁড়াল জেনিফার ফিস ফিস করে বলল-

আমার উপহার?

মুশফিক পকেটে হাত দিয়ে একটা প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিল।

- এটাতো সোহেলের উপহারটা। জেনিফার রেগে গিয়ে বলল। মুশফিক খুব লজ্জা পেল আরে তাইতো সজলের উপহারটা কিভাবে তার পকেটে ঢুকল? এ সময় পেছন থেকে ঝাপিয়ে পড়ল সজল তার উপর। হি হি করে হেসে উঠল জেনিফার।

সোহেলের সঙ্গে ঝাপটাঝাপটি করতে করতে... এক সময় তারা একটা পাহাড়ের কিনারায় চলে এল। মুশফিক ভেবে পাচ্ছে না। সজলের গায়ে এত জোর কিভাবে এল। সে কিছুতেই পারছে না। সে পাহাড়ের খাদের একদম ধারে চলে এল... তারপর হঠাৎ পড়ে গেল মুশফিক... পাহাড়ের গভীর খাদে সে পড়ে যাচ্ছে... পড়ে যাচ্ছে... পড়ে যাচ্ছে... ধক করে উঠল বুকটা। তারপরই জেগে উঠল মুশফিক নিজেকে আবিষ্কার করল খাটের নিচে তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। জানালাটা খোলা হু হু করে বাতাস বইছে। খাটের নিচেই ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকল মুশফিক কাথাটা দিয়ে ঢেকে ফেলল মাথাটা। অন্যরকম একটা আরামে ঘুম আসতে দেরী হলো না মুশফিকের।

মারপিট

স্কুল ছুটির পর মুশফিক বাইরে অপেক্ষা করছিল বাদলের জন্য। কিন্তু বাদলের পাত্তা নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রওনা দিল মুশফিক একাই। খিদে লেগেছে। বাসায় গিয়ে খেতে হবে। এ সময় পেছন থেকে কে জেন ডাকল। পেছন ফিরে দেখে সোহেল দাঁড়িয়ে। সোহেলই হঠাৎ ডাকল

- এই মুশফিক শোন
- কি? এগিয়ে গেল মুশফিক।
- তোর সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা আছে।
- আমার সঙ্গে আবার কি প্রাইভেট কথা?
- আছে জরুরি।
- বল
- এখানে না, একটু ওদিকে চল।
- এখানে বললে সমস্যা কী?
- খুব প্রাইভেট টক...।

বলে একটু আড়ালে নিয়ে গেল মুশফিককে। একটা বড় গাছের আড়ালে, জায়গাটা ঝোপ-ঝাড়ে ভরা পাশেই স্কুলের নিচু দেয়াল।

আর তখনই স্কুলের দেয়াল টপকে আরো দুটা ছেলে ঢুকে। লম্বায় বড় একজনের হাতে একটা রিক্সার চেইন। মুশফিক ওদের ঠিক খেয়াল করল না।

- কি বলবি বল? মুশফিক বিরক্তি নিয়ে বলে।
- কাল তুই জেনিফারদের বাসায় গেলি কেন?
- তুই গেলি কেন?
- আমাকে দাওয়াত করেছে তাই গেছি।
- আমাকেও দাওয়াত করেছে তাই গেছি তোর কী?

- এই তোকে দাওয়াত করেছে মানে? তুই আর বাদল দাগি আসামী জেল খেটেছিস আমরা সবাই জানি।

মুশফিকের মাথায় যেন বিস্ফোরণ হলো। সে আর দেরী করল না ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহেলের উপর।

আর তখনই পেছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আরো দুজন মুশফিকের উপর। মুশফিক হক-চকিয়ে যায়, তার মানে সোহেল প্লান করেই আজ এসেছে। কিন্তু কেন? ও একা আর ওরা তিনজন। খুব দ্রুতই ওরা তিনজন মিলে মুশফিককে মাটিতে পেড়ে ফেলল।

- হারামীর বাচ্চা আর জেনিফারদের পিছনে লাগবি?

বলে প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসায় সোহেল। মুশফিক মাথাটা সরিয়ে নিতেই ঘুষিটা গিয়ে লাগে পিছনের গাছের গুড়িতে। আউ করে চেচিয়ে উঠে সোহেল আর তখনই মুশফিক সুযোগ বুঝে সোহেলের দু পায়ের মাঝখানে .. বেমক্কা জায়গায় একটা জুৎসই লাথি বসায়। ‘ মাগো... ’ বলে দুহাতে বিশেষ জায়গা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ে সোহেল!

সোহেলের সঙ্গের দুজন তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। একজনের হাতে রিকশার চেইন। সেটা সে পাই পাই করে ঘুরিয়ে এগিয়ে আসছে। বাতাসে হিস হিস শব্দ উঠছে। মুশফিক কি করবে বুঝতে পারছে না। আর ঠিক তখনই তার মুখে চিকন একটা হাসি ফুটে উঠল। বাদল আসছে ! যাক আর ভয় নেই। চেইন ঘোড়ানো ছেলেটা তখন ছুটে আসছে মুশফিকের দিকে ... কিন্তু কিছু বোঝার আগেই পেছন থেকে ছুটে এসে বাদল আস্তে করে পা বাধিয়ে দিল চেইন ঘোরানো ছেলেটার পায়ে। বাদল ফুটবল খেলায় পা বাধিয়ে ফাউল করতে ওস্তাদ সেটাই করল। মুহূর্তে ঘুরন্ত চেইন নিয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল ছেলেটা আরেকটা ছেলের উপর। ‘ওরে বাপরে... ’ বলে ককিয়ে উঠল দ্বিতীয় ছেলেটা।

এই মারপিটের নাটক আরো কতক্ষণ চলতো কে জানে। এসময় রঙ্গ মঞ্চে আবির্ভাব হলো স্কুলের দারোয়ান বজলু মিয়ার। সে ওদের দেখেই একটা হুঙ্কার দিল।

- ঐ পোলাপান এইখানে কি? স্কুল ছুটি হইছে কখন। গেলি তোরা...??

ওরা পড়িমরি করে ছুটলো গেটের দিকে। শুধু সোহেলের ছুটতে একটু সমস্যা হচ্ছিল মনে হয়। কেমন লেংচাতে লেংচাতে ছুটছে গেটের দিকে।

গেট দিয়ে বের হয়ে ওরা আলাদা হয়ে গেল। তিনজন গেল একদিকে বাদল আর মুশফিক গেল আরেক দিকে।

- তোকে পিটাল কেন?

- কি জানি বুঝলাম না।

- মনে হয় জেনিফার প্যাঁচ লাগিয়েছে।

- কেন ও প্যাঁচ লাগাবে কেন?

- তুই নাকি রাতে জেনিফারদের বাসায় গিয়েছিলি?

- কে বলল?

- শুনেছি...

- শুধু জেনিফার বাসায় নয় আমি একাই ঐ নোঙর বাড়িতেও গিয়েছিলাম। ঐ মহিলা ঐ বাড়িতেই আছে!

- কি বলছিস তুই কখন গেলি?

- হঠাৎ রোখ চেপে গেল তাই একাই চলে গেলাম...

মুশফিক সব খুলে বলে। তার ভালো লাগছিল না দেয়ালে বসে ছিল সামনে দিয়ে জেনিফার আর সোহেল হেটে গেল বলে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল... তারপর গেল নোঙর বাড়িটাতে সেখানে তাকে ওরা দেখে ফেলে ভূত বলে চেচাল সব খুলে বলল মুশফিক।

- বলিস কি তুই একা এত বড় রিস্ক নিলি?

- নিয়ে ফেললাম হঠাৎ করে।

- এখন আমরা কি করব?

- ঐ মহিলাকে উদ্ধার করব।

- কিভাবে?

- তা জানি না।

- চল পুলিশকে সব খুলে বলি।

- পাগল! পরে আবার আমাদের হাজতে ঢুকাবে।

- তাহলে কি করা যায় বলতো?

- চল আবার যাই দুজন এক সাথে।

- সত্যি যাবি?

- চল...

- কবে?

- কাল ... কাল সন্ধ্যায়
- বেশ। কাল স্কুল বন্ধ আছে।
- বাসায় যাই খিদে লেগেছে।

দুজন দু'দিকে চলে গেল। বাদলের বাসা রাস্তার ওপারে। আর মুশফিকের বাসা এপারেই সিএন্ডবির গলির ঐ মাথায়। সে স্যাৎ করে গলিতে ঢুকে পড়ল। সাধারণত এই গলিতে কেউ চলাচল করে না। তবে এই গলি দিয়ে গেলে শর্টকাট হয়। মুশফিক দ্রুত পা চালায় গলিটা অন্ধকার। ঐ মাথায় একটা আলো জ্বলে শুধু। মুশফিক দেখতে পায় সেই আলোয় চারজন কিশোর দাড়িয়ে আছে। তাদের একজন সোহেল সেটা তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে । এবার সংখ্যায় একজন বেশি এবং দুজনের হাতে চেইন। মুশফিক হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন কি করবে? বাদল যে আবার এসে এখন হাজির হবে তেমন সম্ভবনা নেই। সাগর এলেও লাভ হবে না। এখন ওরা চারজন। ওরা এগিয়ে আসছে... মুশফিক ভেতরে ভেতরে দুর্বল বোধ করে। আর তখনই একটা কাণ্ড ঘটে। ওরা চারজান হঠাৎ পড়ি মরি করে দৌড়ে পালায়। কেন? কি ভেবে ঘুরে তাকায় মুশফিক দেখে তার পিছনে একটা দানব দড়িয়ে আছে। বিশাল লম্বা দানব, মানুষ নয় নিশ্চয়ই। ভয়ে চিৎকার করতে যাবে তখনই দানব কথা বলে ওঠে

তুমি মুশফিক না?
- জ্বি জ্বি।
- তোমার খোঁজেই এই গলিতে ঢুকছি।
- আপনি কে?
- লোকটা খপ করে তার একটা হাত ধরে বলে ' চল!'

একটা রেস্টুরেন্টের ভেতর এক কোণের একটা টেবিলে বসে আছে সেই রহস্যময় ইরফান আলী। মুশফিককে নিয়ে সেখানে ঢুকল লম্বা লোকটা।

- কি খবর চিন্তে পারছ? ভ্রু নাচায় ইরফান আলী ।

ভয়টা কেটে যায় মুশফিকের। সে বসে লম্বা লোকটাও বসে তার পাশে। টেবিলের উপর কাবাব আর পাতলা তন্দুর রুটি। মুশফিকের ভীষণ খিদে পেয়েছিল। ব্যাপারটা বুঝেই যেন ইমরান লোকটা বলে উঠল।

আগে খাওয়া যাক। তারপর কথা।

মুশফিক আর দেরী করল না। মোটামোটি ঝাপিয়ে পড়ল। ইরফান আলী খেতে খেতে মুখ খুলল।

তোমরা যে কেসটার পিছনে ছুটছ। সেটা বেশ জটিল। মহিলাটি কি ঐ বাড়িটায় আছে? তোমার কি মনে হয়?

- আছে।

- কিভাবে বুঝলে?

- আমি গিয়েছিলাম।

ভেরি গুড। আমি জানতাম তুমি যাবে তাহলেতো কাজটা আরো সহজ হয়ে গেল। আমরা কালই যেতে পারি তাকে উদ্ধার করতে

- আপনি যাবেন?

- কেন নয়? তবে ভিতরে যাবে তোমরা । আমি থাকব বাইরে

- কেন?

- কারণ এটা তোমাদের কেস। ইরফান আলী দুষ্টুমীর হাসি হাসে।

এসময় দানবের মতো লম্বা লোকটা কথা বলে ওঠে।

- ওগো কেস তাহলে আপনি এর মধ্যে ঢুকেন কেন?

- কেন ঢুকি জান না? সব রহস্যের পিছনে একজন নারী থাকে শুধু এই রহস্যের সামনে একজন নারী ... পিছনে...

- পিছনে কে?

- পিছনেই আসল রহস্য।

– রহস্যটা কী? খেতে খেতেই প্রশ্ন করে মুশফিক।

রহস্যময় ইরফান আলী মুশফিকের প্রশ্নের জবাব দেয় না। একটা সিগারেট ধরায়। সিগারেটের ধূয়া প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। মুশফিক লক্ষ করে তাদের টেবিলের উপরেই বড় বড় করে লেখা- 'রেস্টুরেন্টের ভেতরে ধূমপান না করার জন্য ধন্যবাদ।'

রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে এসে ওরা বাইরে দাঁড়াল। মুশফিক কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। তার এখন কি বলা উচিত? ইরফান আলীকে খাওয়ানোর জন্য ধন্যবাদ দিবে? তবে খাবারটা দারুণ লেগেছে। বাসায় গেলে শুকনো রুটি আর ডাল খেতে হত মামার রাত্রির মেন্যু আর এখানে কাবাব আর পাতলা তন্দুর রুটি...সাথে সালাদ... উমমম।

- চল মুশফিক তোমাকে এগিয়ে দেই। ইরফান আলী বলে।

- দরকার নেই

- দরকার আছে। চল যেতে যেতে তোমাকে বলছি। বলে হাটা শুরু করে ইরফান আলী । মুশফিক আশ্চর্য হয়ে ভাবে ইরফান আলী কি করে চিনল তার বাসা... ঠিক সেই দিকে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে আসছে দানবের মত লম্বা লোকটা। অনেকেই তার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে।

যেতে যেতে গলা নামিয়ে ইরফান আলী যা বলল ...

'কাল ঠিক ছয়টার সময় তুমি আর বাদল ঐ নোঙর বাড়িটার পেছনে চলে আসবে। আমিও থাকব। রকিও থাকবে। লম্বুর দিকে ইঙ্গিত করে ইরফান। কথাগুলো ঠিক কানে ঢুকছিল না যেন মুশফিকের কারণ তারা তখন জেনিফারদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছে এবং জেনিফারকে তাদের বারান্দায় দেখা যাচ্ছে। বারান্দার লাইটটা অফ করা কিন্তু মুশফিক বুঝতে পারছে জেনিফার তাদের লক্ষ করছে! লক্ষ্য করারই কথা ওদের সঙ্গের লম্বা লোকটা কে যে কেউ দেখলে একবার তাকাবে।

হঠাৎ ইরফান আলী দাড়িয়ে গেল জেনিফারদের বাসার সামনে।

- মনে হয় এ বাসায় তোমার কোনো সমস্যা আছে?

- ইয়ে না মানে... থতমত খেয়ে যায় মুশফিক। জেনিফার এখন ওদের তিনজনকে অবাক হয়ে দেখছে।

- আচ্ছা আমরা চললাম। কাল দেখা হবে। বলেই ওরা দ্রুত চলে গেল। মুশফিক দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে দৌড় দিল নিজের বাসার দিকে এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে।

ঘরটা আট ফিট বাই আট ফিট। একটা টিম টিমে আলো জ্বলছে। ঘরের মাঝখানে চূল ছড়িয়ে বসে আছেন মিসেস রুমানা। আজ দু সপ্তাহ ধরে তিনি এ ঘরটায় বন্দি। ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ এটাচড ছোট্ট টলেটের জানালাটা শুধু খোলা তবে খুপরির মতো জানালার ওপাশে একটা খড় খড়ে দেয়াল। চারিদিকে নিঃশব্দ। তবে মিসেস রুমানা বুঝে গেছেন। তাকে রাখা হয়েছে মাটির নিচের কোনার ঘরটায়। এটা তার শ্বশুরের করা বাড়ি অনেক পুরোনো বাড়ি। এই বাড়ির নিচের ঘরগুলোতে মিসেস রুমানা কখনো আসেন নি। একরকম বলা যায় ভয়েই আসেন নি। আর আজ কিনা তাকেই এখানে বন্দি থাকতে হচ্ছে।

এরা সকালে আর রাতে এই দু বেলা খাবার দেয় তখন জানালা খোলা হয়। ছোট একটা টিফিন ক্যরিয়ারে করে দেওয়া হয় খাবারটা এর কারণ ঐ ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ারটা ঐ জানালার দুই শিকের মাঝখান দিয়ে ঢুকে।

সালেহা বেগম এর আজ কেন যেন ঐ ছেলেদুটোর কথা মনে হচ্ছে। ঐ দিন শ্মশানে যখন তাকে মেরে ফেলতে চাইছিল ওরা তখন ছেলে দুটি কোত্থেকে যে এসে উদয় হয়েছিল, ওদের কারণেই সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিলেন । পরদিন তাড়াহুড়োর কারণে সবটা জানা হয় নি। ঠিকানা দিয়ে ওদের আসতে বলা হয়েছিল পরদিন কিন্তু ওরা আসে নি। ওদের আসলে পুরো ব্যাপারটাও খুলে বলা হয় নি। বলাটা উচিত ছিল।

... তার শ্বশুরের একটা গোপন হিরক খণ্ড আছে। সেটার জন্যই এত কাহিনী। অনেকের ধারণা হিরক খণ্ডটা তার কাছেই আছে বা তিনি জানেন তাই তার পিছনে সব সময় কেউ না কেউ লেগে আছেই। তার স্বামী যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে এত ঝক্কি তাকে সইতে হত না। কিন্তু বেচারা স্বামীটার জন্যই তিনি একরকম জেদ ধরেছেন। এর শেষটা দেখতে চান।

এই অভিশপ্ত হিরক খণ্ডটার কারণেই এত সব কিছু হচ্ছে। স্বামী হারা হলেন তিনি। শ্বশুরও এই জন্যই মারা গেলেন।

একটা হিসাব শুধু মিলে না। ওরা কি সত্যি সত্যিই ঐ দিন শ্মশানে তাকে মেরে ফেলতে নিয়ে গিয়েছিল? হিরক খণ্ড না পেয়েই? নাকি ওরা আসল সত্যটা জেনে গেছে... আসল সত্যিটা কি আসলেই সত্যি?

এখন কটা বাজে? এখন রাত না দিন সেটাও বোঝারও উপায় নেই। মিসেস রুমানা উঠে দাঁড়ালেন। তখনই একটা শব্দ হলো দরজায়। দুপুরের কিংবা রাতের খাবার নিয়ে এসেছে ওরা? মিসেস রুমানা আশ্চর্য হয়ে শুনলেন দরজার তালা খোলা হচ্ছে। সাধারণত দরজার দিকে শব্দ হয় না সব শব্দ হয় জানালায়! আজ কেন দরজা খোলা হচ্ছে?

নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে মিসেস রুমানা । আর সত্যি সত্যি টুক করে প্রায় নিঃশব্দে দরজাটা খুলে যায় ... দরজায় যাদের দেখা যায় তাদের দেখে চমকে উঠেন মিসেস রুমানা সেই কিশোর দুজন! একজন মুশফিক আরেকজন বাদল।

- তোমরা??

-শশশশ...

মুখে আঙ্গুল দিয়ে কথা বলতে নিষেধ করে ওরা। নিঃশব্দে বের হয়ে আসে ওরা তিনজন।

মুশফিক রুমানা বেগমের কাছে একটা বোরখা এগিয়ে দেয়। ফিস ফিস করে বলে-

'এটা পড়ে ফেলুন তাহলে এই অন্ধকারে আর আপনাকে দেখা যাবে না। আমরা সামনে থাকব আপনি ছায়ার মতো আমাদের পিছু পিছু আসুন।'

মিসেস রুমানা তাই করল। মনে হচ্ছে এ ছেলে দুটোর উপর ভরসা করা যায়। বেসমেন্ট থেকে ছোট্ট সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হবে তারপর ডান দিকের দরজা দিয়ে বেরুনো যাবে... তার ভাবতে আশ্চর্য লাগছে নিজের ঘর থেকে নিজেকে পালাতে হচ্ছে ! কি অদ্ভুত কাণ্ড।

সিঁড়ির পাশের দরজাটার পাশে বসে আছে ছগীর। এই দরজায় তার বারটা পর্যন্ত ডিউটি। যেহেতু নিচের বেজমেন্টে একজন বন্দি আছে। তাই

এই পাহাড়ার ব্যবস্থা। সেলিম এলেই সে চলে যাবে। আজকের আবহাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাড়ি গিয়ে একটা আরামের ঘুম হবে। সেলিম হারামজাদাটা আসতে দেরী করছে কেন বুঝতে পারছে না। অবশ্যই ঐ দিনের ঘটনার পর থেকে ব্যাটা কেমন যেন সিটিয়ে গেছে সে নাকি ছোরা দুটোর ভুত দেখেছে এই বাসায়! আরে গর্দভ যে ছোরা দুটোকে নিজের হাতে পানিতে ফেলে মেরে এলাম ... হঠাৎ ছগির আর ভাবতে পারে না। তার চোয়াল ঝুলে পড়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সে! হঠাৎ তার দম আটকে আসে ... হৃদপিণ্ডটা গলার কাছে এসে ধ্বক ধ্বক করছে... কারণ আর কিছুই না ... তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুর্তিমান দুই প্রেত... যাদের বস্তায় ভরে সে আর সেলিম নিজ হাতে মেঘনায় ফেলে মেরে এসেছে... তারা তার সামনে!! ... জ্ঞান হারাবার আগে সে বুঝতেই পারল না তার সামনে দিয়ে নিঃশব্দে বেড়িয়ে গেল তিন জন, কোন ঝুট ঝামেলা ছাড়াই। মুশফিক বাদল এর দুই প্রেত আর মিসেস রুমানা।

- তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার বাড়িতেই ওরা আপনাকে আটকে রেখেছিল?

- হ্যাঁ

- কেন?

- সে অনেক বড় গল্প আপনাকে বলব কিন্তু তার আগে আমার বাসায় পুলিশ ফোর্স পাঠান। ওরা যখন টের পাবে আমি পালিয়ে গেছি তখন ওরাও পালাতে পারে।

- ওরা পালাবে না। বলে হাই তুলে ওসি সাহেব।

- আপনি কি করে বুঝলেন ওরা পালাবে না।

- বললামতো পালাবে না। আপনার গল্প শেষ করুন। আপনি কিভাবে পালালেন ঐ বাসা থেকে?

- দুটো বাচ্চা ছেলে ...

- উফ! বুঝতে পেরেছি... বাদল আর মুশফিক নামের ফাজিল ছোড়া দুটো আবার মাঠে নেমেছে!

- ফাজিল হবে কেন?

- সে কাহিনী পরে শুনবেন এখন বলুন আপনার পিছনে ওরা কেন লাগল? মানে ঐ দলটা ... কেন? আসল রহস্যটা কি?

- দেখুন আপনি এখুনি পুলিশ ফোর্স নিয়ে যাবেন কিনা ইয়েস ওর নট?

বলে মিসেস রুমানা উঠে দাঁড়ায়।

আহা রুমানা আপা বসেন বসেন ... রাগ করেন কেন? চা খান এই চা দাও।

দেখুন আমি কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ আনতে বাধ্য হব। একজন বিপদগ্রস্ত মানুষ হিসেবে আপনার সাহায্য চাচ্ছি আর আপনি দেরী করছেন।

এ পর্যায়ে হো হো করে হেসে উঠে ওসি সাহেব।

- আপা আপনি ঐ বাড়ি থেকে বের হবার পর পরই ওদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ওদের কুরমিটোলা থানা হাজতে নেয়া হয়েছে। কারণ আপনার বাড়িটা ঐ থানার আন্ডারে পড়েছে। কেস করতে আপনাকে এখন ঐ থানায় যেতে হবে।

- কিন্তু

- দেখুন আপনার কেসটা জটিল। আমাদের নজরে ছিল শুরু থেকেই। এসবির আন্ডারে ছিল কেসটা। তবে হ্যাঁ স্বীকার করতেই হবে। ঐ ছেলে দুটোর কারণে কিন্তু ওদের গ্রেফতার করতে পারলাম। ঐ বাড়িটা আমাদের নজরদারিতে ছিল। আপনি বরং দেরী না করে ঐ থানায় চলে যান। আমি গাড়ি দিব সঙ্গে?

ওসি সাহেব অবশ্য জোর করে মিসেস রুমানাকে তাদের একটা গাড়িতে উঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন কুর্মিটোলা থানায় যেতে। সাদা রংয়ের গাড়িটা অবশ্য তা করল না। এদিক ওদিক ঘুরে হঠাৎ একটা গলিতে ঢুকিয়ে দিল। দু পাশ থেকে কিছু লোক এসে মিসেস রুমানার মুখে কিছু চেপে ধরল। এ্যামোনিয়ার কটু গন্ধ মুখে নিয়ে জ্ঞান হারালেন মিসেস রুমানা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো কিডন্যপ হলেন তিনি।

মিসেস রুমানার শ্বশুরের একটা হিরক খণ্ড ছিল তিনি যেটা পেয়েছেন তার পুর্বপুরুষের কাছ থেকে। সে বহু বছর আগের কথা। বংশানুক্রমে হিরক খণ্ডটা এসে পৌঁছায় মিসেস রুমানার স্বামীর কাছে। মিসেস রুমানার স্বামী ওয়াহাব সাহেব পেশায় একজন শিল্পী ছিলেন তিনি করলেন কি ঐ হিরক খণ্ডটার একটা হুবহু থ্রিডি কপি তৈরি করলেন এবং সেটা রাখলেন ব্যাংকের লকারে আর আসলটা রাখলেন নিজেদের কাছে

- কেন এ কাজ করলেন?

- অন্য উত্তরাধিকারীরা যেন জানে হিরক খণ্ডটা ব্যাংকে আছে

- এই হিরক খণ্ডের অন্য উত্তরাধিকারী ছিল?

- হ্যাঁ মিসেস রুমানার শ্বশুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দিক থেকে কিছু উত্তরাধিকারী আছে। যদিও মিসেস রুমানার স্বামীর আইনগত আসল দাবিদার তার নামেই উইল করা। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি খুন হয়ে গেলেন।

- কারণ?

- কারণ ঐ হিরক খণ্ড।

- খুব দামি ওটা?

- অবশ্যই , তাছাড়া দামের চেয়ে এর ঐতিহ্যের মূল্য অনেক বেশি।

- কারা খুন করল?

- যারা মেরে ফেলতে চেয়েছিল মিসেস রুমানাকে তারাই।

- মেরে ফেলতে চেয়েছিল কেন?

- তারা আসলে নকল হিরেটা পেয়ে গিয়েছিল। মনে আছে একবার ঢাকার একটি প্রাইভেট ব্যাংকের ভল্ট থেকে সব চুরি হলো। ওখান থেকে নকল হিরেটাও চুরি হয়। প্রতিপক্ষ ভাবল হিরে চুরি প্রসঙ্গ চাপা পড়বে মিসেস রুমানার স্বামীকে মেরে ফেললেই। কারণ এর নকল একটা কপি যে ব্যাংকে আছে ধোকা দেবার জন্য সেটা মিসেস রুমানাও জানতেন না। হয়ত এখনো জানেন না। জানতেন শুধু তার স্বামী।

- উফ এত জটিলতা!

- হ্যাঁ কেঁচো খুড়তে সাপ বের হয়। এ কেসে বের হয়েছে বিশাল সাইজের এক আফ্রিকান এনাকোন্ডা।

- আচ্ছা আপনি এত কিছু জানলেন কিভাবে?

ইরফান আলী এবার দাঁত মুখ খিচিয়ে হাই তুললেন। বাদল মুশফিক আর ইরফান আরী একটা রেস্টুরেন্টে বসে খেতে খেতে গল্প করছিল। তারা তখনও জানে না যে, মিসেস রুমানা আবারও কিডন্যাপড হয়েছে।

তবে ইরফান আলী জানে।

আচ্ছা আপনি এত কিছু জানেন কিভাবে? আবারও প্রশ্ন করে বাদল।

আসল হিরেটা আসলে ঠিক কোথায় আছে?

- একটা গল্প বলি। একটা মুরগির ছানা রাস্তা পার হবে। দিল দৌড়। বিষয়টা কোয়ান্টাম বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ খেয়াল করলেন তিনি তখন বললেন-

'যেহেতু মুরগির বাচ্চাটা দ্রুত ছুটে রাস্তা পার হচ্ছে কাজেই বাচ্চাটার অবস্থান আর তার দৌড়ের গতি আমরা এক সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে না। ...হা হা হা ... এটা কেন বললাম জান? আমি খেয়াল করেছি তোমরা সবসময় এক সঙ্গে দুজনই প্রশ্ন কর... এই জগতে একটি জিনিসের দুটি বিষয়কে একই সঙ্গে ব্যাখ্যা করা যায় না... অনেকটা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্রের মতো। তবে হ্যাঁ আমি হাইজেনবার্গ নই তার তস্য তস্য তস্য ভাব শীর্ষ বলতে পার।

তখন ইরফান আলী অদ্ভুত একটা কাণ্ড করলেন চোখ বন্ধ করে শরীরের মধ্যে কেমন একটা ঢেউ তুললেন। ঢেউটা পেটের মধ্যে শুরু হয়ে গলার মধ্যে দিয়ে যেন মুখে এসে শেষ হলো। বাদল আর মুশফিক অবাক হয়ে

দেখল মুখ খুললেন ইরফান আলী তার জিবের উপর একটা কিছু ঝিলিক দিয়ে উঠল। তিনি সেটা হাতে নিলেন হাতের তালুতে জলপাইয়ের আকারে ঝক ঝক করছে একটা অদ্ভুত হিরক খণ্ড!

তারা যেহেতু একটা রেস্টুরেন্টের কেবিনে বসেছিলো তাই হিরক খণ্ডের দ্যুতি কেবিনের বাইরে গেল না। কেউ জানতেও পারল না।

পেটের ভেতর কিছু লুকিয়ে রাখার কৌশলটা আমি এক ভারতীয় যোগীর কাছে শিখেছি। হ্যাঁ হিরকটা আমার কাছেই আছে।

আসল হিরক খণ্ডটা আপনার কাছে?

কিন্তু কিভাবে?

হা হা হা ... তাহলে চল আবার হাইজেনবার্গের কাছে যাই। চট করে রুমালে প্যাঁচিয়ে হিরক খণ্ডটা পকেটে চালান করে দিলেন ইরফান আলী। জার্মানির মিউনিখ শহরে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ হাইজেনবার্গ একবার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশ জোড়েই চালাচ্ছিলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট তাকে থামাল। বলল- ' আপনি কি জানেন আপনি কত জোড়ে চালাচ্ছেন আপনার গাড়ি?'

'না , তবে এটা জানি আমি কোথায় যাচ্ছি...! '

এবার বলি হিরক খণ্ডটা আমার কাছে কেন? কারণ আমি মিসেস রুমানার স্বামী মিঃ ওয়াহেদ উদ্দীন... আমি হ্যাঁ আমি বেঁচে আছি ... শত্রুর নাকে-মুখে ছাই দিয়ে এখনো বেঁচে আছি এবং এই রহস্যময় হিরকখণ্ডটার কারনে আমি সব আগাম খবর কিভাবে কিভাবে যেন পেয়ে যাই। যেমন এই মুহূর্তে আমি জানতে পারলাম রুমানাকে আবার কিডন্যাপ করেছে ওরা...

কি বলছেন?

হ্যাঁ চল এক্ষুণি চল...

তারা তিনজন এক সঙ্গে ছুটে বের হলো।

লম্বু রকি আগে থেকেই গাড়িতে বসেছিল। ওরা উঠা মাত্র গাড়ি স্টার্ট দিল। ওরা ছুটল...

থানা হয়ে পুলিশ নিয়ে ওরা দুটো গাড়িতে করে আবার ছুটল। ওসি সাহেব এক গাড়িতে। ওরা ওদের গাড়িতে পিছন পিছন। যেতে যেতে মুশফিক হঠাৎ ফিস ফিস করে ইরফান আলী কে বলল

- আচ্ছা হিরেটা যদি আপনার কাছেই আছে তাহলে এত ঘটনার দরকার কি ছিল?

- আর আপনিইবা মারা গেছেন এমন ধারণা দেওয়ার দরকার ছিল কেন?

ইরফান আলী ওরফে ওয়াহেদ উদ্দীন মৃদু হাসলেন। তারপর বল্লেন

- আবার একই বিষয় নিয়ে দুটো প্রশ্ন। তবে সঠিক প্রশ্ন।

- একটা সাদা একতলা বাড়ি। বিড় বিড় করে বলল ইরফান আলী ওরফে ওয়াহেদ উদ্দীন।

- ইরফান সাহেব আপনি কিন্তু বহুত ঝামেলা করছেন। ক্রিমিনাল যদি এই বাড়িতে না থাকে তাহলে কিন্তু মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভোগান্তি করার জন্য আপনাকে আবার হাজতে ঢোকাব।

- জ্বি অবশ্যই। আপনারা ঢুকে পড়ুন।

- এই সাদা বাড়িতে ?

- হু

- আপনি সিওর? ঢুকব??

- একমিনিট। বলে ইরফান আলী ঘুরে দাঁড়াল। পিছনের বাড়িটা অতিরিক্ত রং।ঙে কোনো রং বাদ নেই । খুঁজলে সাত রংই পাওয়া যাবে বোধহয় বেনীআসহকলা...?

ইরফান আলী ঘুরে তাকাল বাদল আর মুশফিকের দিকে।

- আচ্ছা বলতো খারাপ রং কোথায় শেষ হয়? ওরা দুজন অবাক হয়ে একজনের দিকে আরেকজন তাকায়। ইরফান আলী আবার ফিস ফিস করে 'প্রিজমে'

- ওসি সাহেব এই বাড়িতে। সম্পূর্ণ উল্টা দিকের বাড়িটা দেখায় ইরফান আলী।

- এটা সাদা রংএর বাড়ি হলো কিভাবে? প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে ওসি সাহেব। ' ফাজলামো পেয়েছেন আপনি? '

- সাত রং মিলেই হয় সাদা... হাসি মুখে বলেন ইরফান আলী।

ওসি সাহেব যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে সাতরঙের বাড়িটাতে ঢুকে যান তার দলবল নিয়ে। ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে থাকে দূরে। লম্বা লোকটা দাড়িয়ে

থাকে আরো দূরে একটা ল্যাম্পপেস্টের পাশে। যেন সে নিজেই আরেকটা ল্যাম্পপোস্ট।

মিসেস রুমানার উদ্ধার পর্বটা হলো খুব সাদাসিধেভাবে।

একজন মহিলা আর চারজন পুরুষ ধরা পড়ল। পরে জানা গেছে মহিলাটি আসলে মহিলা নয় সেও পুরুষ। মহিলা সেজে থাকত। তবে মিলন পর্বটা হলো খুব সুন্দর। মিসেস রুমানা আর ইরফান আলী থুড়ি ওয়াহেদ সাহেবের মিলনটা হলো খুব সুন্দর ভাবে। কাঠ খোট্টা ওসি সাহেব পর্যন্ত কেঁদে ফেললেন। দূরে দাঁড়িয়ে লম্বুকেও চোখ মুছতে দেখা গেল।

ওসি সাহেব মুশফিক আর বাদলকে ধন্যবাদ দিলেন। কারণ তারা ইনিসিয়েটিভ নেওয়ায় নাকি থলের বেড়াল বের হয়ে এসেছে তাবে বিড়াল কালো না সাদা সেটা বলেননি। অনেক রুই কাতল মৃগেল... একটা তিমিও নাকি ধরা পড়েছে। তবে তিমিকে জেলে ঢোকাতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন ওসি সাহেব।

- জেলে ঢোকাতে না পারলেও ওকে আমি লেজে এমন খেলাব যে ওর সব তেল ঝড়ে যাবে।

ইরফান আলী ওরফে ওয়াহেদ উদ্দীনকে নাকি তিনি টোপ হিসেবে ব্যবহার করে এই কেসের কাজ করছিলেন। ইরফান আলী যে মিসেস রুমানার স্বামী তাও জানতেন তিনি। তাকে নিয়েই কেসটা সাজিয়েছেন তিনি। এমনটাই বললেন ওসি সাহেব।

- বুঝলে ভায়া পুলিশের কাজে অনেক খারাপ হতে হয়। মেজাজ ঠিক রাখা সত্যি মুশকিল হয়ে যায়। ভালো মানুষের সাথে ঘুরি নাকি আমরা? আমাদের কাজ কারবার সব চোর ডাকাত খুনির সাথে... কি বল?

বাদল আর মুশফিক মাথা ঝাকায়।

- চল তোমাদের নামায়া দিয়ে আসি।

না না করেও লাভ হলো না। উঠতে হলো পুলিশের পিকআপ ভ্যানে।

মিসেস রুমানা আর ওয়াহেদ উদ্দীন দুজন এখন যেতে পারবেন না তাদের অনেক ফর্মালিটিস আছে। তারা বিদায় জানালেন। বললেন শিগ্রী তাদের আবার দেখা হবে দু'টা বিশেষ অকেশনে

- দুটা কেন?

- সময় হলেই জানবে

- আচ্ছা...। দুজনেই হাত নাড়ে।

- লোকটা পাগল কিসিমের। ওসি সাহেব নিজেই গাড়ি চালাতে চালাতে বলেন। ... পাগল হলেও লোক ভালো।

বাদল আর মুশফিককে ওদের বাসার গলির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে ওসি সাহেব চলে যান। এবং যাওয়ার সময় হুশিয়ার করে দিয়ে যান। এসবে যেন আর না জরায়। তারাও মাথা ঝাকায়, আর জরাবে না।

- চল

- কোথায়?

- সিঙ্গারা খাই

- চল

তারা দুজন তাদের পাড়ার মোড়ের মজিদের দোকানে ঢোকে। দোকানটা ভাঙা চুড়া কিন্তু সিঙ্গারা বানায় অসাধারণ। তারা ঢোকা মাত্র গরম গরম সিঙ্গারা চলে এল সাথে সস্ আর পিঁয়াজ। অন্য সব দোকানে সিঙ্গারার সঙ্গে শশা দেয় কিন্তু এই দোকানে দেয় পেঁয়াজ। পেঁয়াজ দিয়ে সিঙ্গারার মজাই আলাদা।

সিঙ্গারা খেতে খেতে মুশফিকের মনটা উদাস হয়ে যায়। এ ক'টা দিন বেশ একটা উত্তেজনার মধ্যে ছিল। এখন সব উত্তেজনার অবসান হয়েছে। আবার সেই পড়াশুনা... স্কুল! সেই শ্মশানের ঘটনা দিয়ে শুরু তারপর কত কাহিনী। এখন সব কাহিনী ঝির ঝির!

- কিরে কি ভাবিস?

- ভাবছি বেশ কাটল কটা দিন আমাদের কি বলিস?

- হ্যাঁ তা কাটল... আবার সেই স্কুলে যেতে হবে... বদি স্যারের প্যাঁদানী

- কানে ধরে দাঁড়ানো...

- তাও আবার জেনিফারদের সামনে... কি বলিস?

- ধূৎ... চল বাসায় যাই।

- চল।

ওরা বাসার দিকে রওনা দেয়। বিকেলের সূর্য তখন ডুবতে শুরু করেছে। সিএন্ডবির দেয়ালর ওপাশে। তাদের দুজনের ছায়া লম্বা হয়ে তাদের অনুসরণ করতে থাকে। তারা টের পায় না।

সবশেষে...

যাদুঘরের অডিটরিয়ামে একটা ছোট খাট অনুষ্ঠানের মতো হলো। ইরফান আলী অর্থাৎ ওয়াহেদ সাহেব আর মিসেস রুমানা যৌথভাবে তাদের সেই বিখ্যাত হিরক খণ্ডটি অফিসিয়ালী দান করলেন যাদুঘরে। তার উপরই এই অনুষ্ঠান। অনেক চ্যানেল সাংবাদিকরা সব ভীড় করেছে। ওসি সাহেবকেও দেখা গেল। তাকে আজ অন্যরকম লাগছে। সুন্দর একটা পাঞ্জাবী পড়ে আছেন। তাকে আজ আর পুলিশ পুলিশ লাগছে না। মনে হচ্ছে নিজেদরই চাচা মামা কেউ । মুশফিক একাই এসেছে। বাদল হঠাৎ করে কক্সবাজার বেড়াতে গেছে বাবা-মার সাথে । একা একা বসে থাকতে মুশফিকের ভালো লাগছিল না।

মঞ্চে বসে আছেন ওয়াহেদ উদ্দীন আর মিসেস রুমানা ওয়াহেদ, ওসি সাহেব আর যাদুঘরের মহাপরিচালক। অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। যাদুঘরের মহাপরিচালক হিরক খণ্ড দান করার জন্য উনাদের ধন্যবাদ দিলেন। ওসি সাহেব এই হিরক খণ্ড উদ্ধারের দুধর্ষ বর্ণনা দিলেন। সে খানে মুশফিক আর বাদলের নামও বলা হলো। ওয়াহেদ সাহেব বক্তব্য রাখলেন সবার শেষে তিনিও মুশফিক আর বাদলের কথা বার বার বললেন। বাদল না থাকায় সবাই মুখ ঘুরিয়ে বার বার মুশফিককে দেখতে লাগল। দু একজন ছবিও তুলল। মুশফিকের দারুন লজ্জা লাগছিল। মনে হচ্ছে ... ধুৎ না আসলেই ভালো হত।

সব শেষে আসল অনুষ্ঠান। হিরক খণ্ডের বাক্স হস্তান্তর করা হলো অফিসিয়ালী। মিসেস রুমানা হিরক খণ্ডের বাক্সটা তুলে দিলেন যাদুঘরের মহাপরিচালকের হাতে। চারদিকে তালি তালি। ক্যামেরার ফ্লাশ আর ফ্লাশ চোখ ধাধিয়ে যাবার অবস্থা।

অনুষ্ঠান শেষ এখন সামান্য চা চক্র। পাশেই লম্বা টেবিলে চা সামুচা আর কেক সাজানো আছে। মুশফিক একটা সামুচা নিয়ে কামড় দিতে যাবে তখন পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল

- কেমন আছ মুশফিক?

চমকে পেছন ফিরে তাকায় মুশফিক দেখে জেনিফার।

- তুমি এখানে? কোনোমতে বলে মুশফিক

- বাহ আমার বাবা যাদুঘরের সিক্যুরিটি চিফ না?

- ওহ ! মুশফিকের গলায় সামুচা আটকে যায় যেন। আর কথা খুঁজে পায় না মুশফিক।

- কাল স্কুল খোলা জান? জেনিফার খুব স্বাভাবিক ভাবে বলে

- হু জানি

- আচ্ছা ঐ হিরাটা তুমি দেখেছ?

- দেখেছি

- অনেক বড়?

- হু। মাথা নারে।

- আমিও দেখব। কাল স্কুলে যাবেতো?

- যাব।

- তোমার জন্য সীট রাখব। তোমাদের এ্যাডভেঞ্চারের গল্পটা বলবে কিন্তু। যাই বাবা ডাকছে। জেনিফার হাত নেড়ে চলে যায়।

ফুরফুরে একটা বাতাস বয়ে যায় মুশফিকের বুকের ভেতর দিয়ে। একটু আগের মন খারাপ ভাবটা দূর হয়ে গেছে। সে এক কাপ চা ঢেলে নেয়, চা'টা দারুণ। এ সময় তার পাশে এসে দাঁড়ায় ইরফান আলী ওরফে ওয়াহেদ উদ্দীন।

- এই যে ওয়ান অব দ্যা এ্যাডভেঞ্চারার তোমার সঙ্গে জরুরি দরকার।

- বলেন।

এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি একটা কাগজে মোড়ানো জিনিস মুশফিকের পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন ।

- কি এটা?

- তোমাদের পুরস্কার।

- মানে?

- মানে বাসায় গিয়ে দেখ। বলে হাত নেড়ে অতিথিদের ভীড়ের মধ্যে হাড়িয়ে গেলেন।

মুশফিক অবশ্য দেরী করে না একটু আড়ালে গিয়ে প্যাকেটটা খুলেই বুঝে যায়। সেই হিরেটার রেপ্লিকা কপি। মানে নকলটা।

অনুষ্ঠান শেষ সবাই চলে যাচ্ছে। হঠাৎ নতুন করে একটা হাউ কাউ শুরু হলো। কি হলো? সাংবাদিকরা দাবি করছে হিরেটা একটু হলেও দেখানো হোক তারা ছবি তুলবে। তাইতো না দেখালে কিভাবে বুঝব যে ওটা আসলেই হিরে? যাদুঘরের মহাপরিচালক রাজী হচ্ছিলেন না তার যুক্তি দু'দিন পর যখন গ্যালারীতে হার্ড গ্লাস কাসকেটের ভেতর প্রদর্শন করা হবে পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে তখনই না হয় দেখানো হবে। কিন্তু সাংবাদিকরা নাছোড়বান্দা একবার হলেও দেখানো হোক। তারা ছবি তুলে নিয়ে যেতে চায় তাদের পরের দিনের কাগজ ধরাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত মহাপরিচালক রাজী হলেন। তাদের সামনে উন্মুক্ত করা হলো... ছোট্ট কাঠের বাক্সটি। এক মুহূর্তের জন্য ঝিলিক দিয়ে উঠল হিরেটা। তারপর হঠাৎ সব কারেন্ট চলে গেল... পাওয়ার ফেইল!! সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার চেচামেচি ... হই হুল্লুর...!

এসব যখন হচ্ছিল তখন মুশফিক যাদুঘরের টয়লেটে। ছোটকাজ সেরে বেরুবে, তখনি দুটো লোক ছুটে এল টয়লেটে। দুজনেই এত উত্তেজিত যে তারা মুশফিককে খেয়ালই করল না। কি মনে করে মুশফিক একপাশে সরে এল যেন ওরা দেখতে না পায়।

'জলদি ফয়েল পেপার দিয়ে মোরা হিরেটাকে।' হিরে শুনেই কান খাড়া করল মুশফিক। এবং তাদের কথাবার্তা ... আচার-আচরণে সে বুঝে গেল এই মাত্র তারা যেভাবেই হোক মূল্যবান হিরেটা হাত করেছে এবং সেটা ফয়েল পেপারে মোড়াচ্ছে যেন বের হওয়ার সময় চেকিংয়ে ধরা না পড়ে। তখনই

'আহ কি করলি?... ' বলল একজন এবং বোঝা গেল হিরেটা ফয়েল কাগজে প্যাঁচাতে গিয়ে হাত ফসকে পড়ে গেছে... আর কি আশ্চর্য সেটা মার্বেলের মতো গড়াতে গড়াতে একদম মুশফিকের পায়ের কাছে এসে থামল। মুশফিকের মাথায় দ্রুত চিন্তা চলে, সে চট করে পকেটের নকল হিরেটা আসল হিরের জায়গায় রেখে আসল হিরেটা সরিয়ে ফেলে। এবং নিঃশব্দে আরো পিছনে অন্ধকারে সরে আসে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে টয়লেটের এক সাইডের লাইটটা নষ্ট বলে জায়গাটা বেশ অন্ধকার।

সেখানেই সিটিয়ে দাড়িয়ে থাকে মুশফিক। বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করছে।

ওদের একজন এগিয়ে এসে ব্যস্ত হয়ে নকল হিরেটা তুলে নেয়

- কিছু হয় নিতো? একজনের বিরক্ত গলা!

- না কি হবে। হিরের ক্ষতি হওয়া এত সোজা?

- জলদি র‍্যাপ কর ফয়েল পেপারে ...দেখিস আবার ফেলিস না ... গাধার মতো এক একটা কাজ করিস। এরা কি সেই তারা? মুশফিক বুঝতে পারে না। নাকি অন্যদল?

তারা ওখানে র‍্যাপিং ছারাও আরো কিছু করল যেন ... তারপর দ্রুত বের হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুশফিকও সাবধানে বের হয়ে এল। তখনও ঐ সাইডটায় অন্ধকার। চারদকে হাউ কাউ চেচামেচি। মুশফিক কি করবে বুঝতে না পেরে বের হয়ে চলে এল, গেটে অনেককে চেকিং করলেও মুশফিককে কেউ কিছু বলল না।

মুশফিক হাটা দিল বাড়ির দিকে। কি আশ্চর্য কাণ্ড আসল হিরেটা এখন তার পকেটে!!

জেনিফার মুখ কালো করে ওদের একতলা বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মুশফিককে দেখে তার মুখের কোন ভাবান্তর হলো না।

- স্কুলে যাবে না? মুশফিক বলে।

- না

- কেন?

- কাল রাতে ঐ হিরেটা চুরি হয়েছে জান? প্রায় কান্না কান্না গলায় বলে জেনিফার।

- হ্যাঁ আজ পেপারে দিয়েছে।

- বাবার এখন মহা বিপদ! আজ বারোটার মধ্যে বাবাকে ওটা উদ্ধার করতে হবে যেভাবেই হোক। কারণ সিক্যুরিটির দায়িত্বে ছিলেন বাবা।

- চাচা কোথায়?

- বাসায়। বাবা ভেবে পাচ্ছেন না কি করবেন

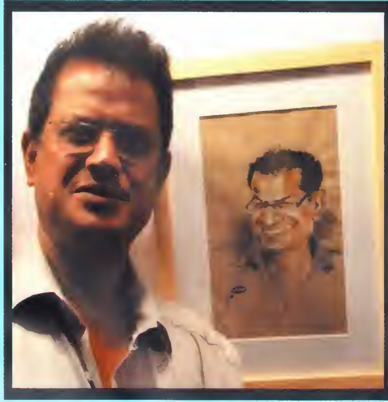
- চাচাকে চিন্তা করতে না কর। বেশ জোড় গলায় বলে মুশফিক

- মানে? অবাক হয়ে তাকায় জেনিফার মুশফিকের দিকে। এত বড় বিপদের কথা শোনেও কেন মুশফিকের মুখটা হাসি হাসি?

মুশফিক পকেট থেকে কাগজে মোড়ানো হিরেটা বের করে জেনিফারের দিকে এগিয়ে দেয়, বলে...

- চাচাকে দাও এটাই আসল হিরে। কাল যেটা খোয়া গিয়েছিল সেটা ছিল নকল।

জেনিফার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ ভালো লাগে মুশফিকের।



আহসান হাবীব। জন্ম ১৯৫৭, সিলেটে। ব্যাংকার হিসেবে জীবনের শুরু। তারপর পেশাদার কার্টুনিস্ট। দেশের সবচে পুরোনো পত্রিকা উন্মাদের সম্পাদক/প্রকাশক। জোকস তার প্রিয় বিষয়। রম্য লিখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। ছোটদের জন্যও ইদানিং লেখা শুরু করেছেন।

ব্যাক্তিগত জীবনে শিক্ষিকা স্ত্রী আফরোজা আমিন আর কন্যা এষাকে নিয়ে পল্লবীতে বসবাস করেন।